পঞ্চপ্রদীপ

শ্রীবাণী গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২/১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—:

প্রথম সংস্করণ
৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৫৪

প্রকাশক
শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, স্বত্বাধিকারী
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২/১, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

রূপসজ্জা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২/১, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী প্রেস
১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

তারাশঙ্কর

শ্রীমতী রমা গুপ্ত ইতিহাসের ছাত্রী। ইতিপূর্বে তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য সুললিত ভাষায় উপন্যাসের মত মনোরম করে মূল ও প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে 'ছেলেদের বাবর', 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর', 'ছেলেদের আওরঙ্গজীব' ও 'সিংহলকুমারী পদ্মিনী' রচনা করেছেন। সেগুলি ইতিহাস হলেও তাদের রচনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সাহিত্যবোধ ও শিল্পদৃষ্টির পরিচয় আছে। বর্তমানে এই বইখানিতে যে গল্পগুলি তিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন সেগুলি তাঁর নিজস্ব স্বাধীন রচনা। গল্পগুলি আধুনিক কালের সংকটময় জীবনের কাহিনী নয়। গল্পগুলির অধিকাংশই ইতিহাসগন্ধী। কোন কোন গল্প আধুনিক কালের সঙ্গে সূক্ষ্মসূত্রে গাঁথা থাকলেও আধুনিক কালের বস্তুর খুঁটিনাটি ও সকল সংকটের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বিস্মৃত কালের ছায়ান্ধকারকে অবলম্বন করে রচিত। দীর্ঘকাল অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসপাঠের ফলে ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের রূপবর্ণগন্ধের যে স্বপ্নময় পরিবেশ তাঁর মনোলোকে সৃষ্ট হয়েছে সেই স্বপ্নময় পরিবেশকেই তিনি বিভিন্ন গল্পে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। গল্প রচয়িত্রী হিসাবে হয়তো তিনি সকল গল্পে সমান সার্থকতা লাভ করতে পারেন নাই, তবু পাঠকবর্গ গল্পগুলিতে ভারতীয় ইতিহাসের এক এক যুগের সুস্পষ্ট স্বাদ পাবেন এ কথা নিঃসন্দেহ। 'আবর্তন', 'স্ফটিকপাত্র', 'তমসা বা জ্যোতির্ময়', 'কণ্ঠহার', 'পঞ্চপ্রদীপ' প্রভৃতি রচনাগুলি বিশেষভাবে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ গল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। এই তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ। সে হিসাবে পাঠকসমাজের সম্মুখে এটি উপস্থাপিত করতে তাঁর সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।

৮/২/৪৭.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

"পঞ্চপ্রদীপ" আমার প্রথম ছোট গল্পের বই, এর গল্পগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। বই খানি প্রকাশের পূর্ব্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ ক'রে গল্পগুলি যত্নের সঙ্গে দেখে দিয়েছেন এজন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ।

বইখানির সফলতা নিরূপণের ভার পাঠক সাধারণের কাছে।

নয়া দিল্লী,
৪ঠা কার্ত্তিক, মহাষ্টমী
১৩৫৪

লেখিকা

স্ফটিক পাত্র

প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে খনন কার্য্য চলেছে। মধ্য ভারতের কোনও একটা জায়গা—গবেষকদের ধারণা জায়গাটা ইতিহাসের পুরানো কয়েকপৃষ্ঠার ঘটনা বহন করে—কাজেই যদিও সম্প্রতি গভীর অরণ্যানীতে ঢেকে গেছে এই জায়গাটির চারিপাশ—কিছু দূরেই বিন্ধ্যাচলের দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নত শীর্ষগুলি দেখা দিচ্ছে—তবুও এরই মধ্যে এসেছেন একদল উৎসাহী শিক্ষিত ছাত্র—উদ্দেশ্য তাঁদের ধরিত্রীর বুকে লুকানো ইতিহাসকে খনন করে বাইরে টেনে নিয়ে আসা—পৃথিবীর চোখে ভারতের সভ্যতার একটি সুন্দর ও শোভন প্রমাণ উপস্থিত করা—নিজেদের মূল্যটাকে ঐতিহাসিক কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে দেখা।

প্রায় মাস খানেক হ'ল দলটি এখানে এসেছেন—সঙ্গে তাঁদের

কুলির দল আর আনুসঙ্গিক জিনিষপত্রাদি। এই মাস খানেক সময়ের মধ্যে চারি পাশের ঝোপ জঙ্গল খানিকটা পরিষ্কার করে ছাত্রেরা জায়গাটা বসবাসের উপযোগী করে তুলেছে—প্রায় দশ বারো খানি তাঁবু ফেলে জায়গাটা ছোটোখাটো একটা সৈন্য বারাকের মত করে নিয়েছে। দূরের প্রান্তরে কুলিরা কাজ করে—ছাত্রেরা উপস্থিত থাকে সেখানে সারাদিন—কুলীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়, মাটীর নীচে যে প্রাচীন সহর বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তারই কঙ্কাল আবিস্কারের জন্য তাদের আগ্রহের সীমা নেই। কোনও সময়ে এখানে যে একটি স্রোতস্বতী নদী ছিল সেটার প্রমাণ পাওয়া গেছে অভ্রান্ত ভাবেই। তারপরে প্রকৃতির খেয়ালে সে স্রোতের ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে—শুষ্ক হয়ে গেছে নদীর বুক। নদীকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল এখানে এক প্রাচীন সভ্যতা এমন একটা প্রমাণের আভাস মিলছে সকলের মনে।

ছাত্রদলের ভার নিয়ে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রফেসর গুপ্ত। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। তীক্ষ্ণবুদ্ধি—মননশক্তি সুপ্রচুর—সুন্দর সহজ মনোবৃত্তি—বলিষ্ঠ দেহ—ছাত্রসমাজে অধ্যাপক গুপ্ত অত্যন্ত প্রিয়—সহকর্ম্মীদের কাছে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই খনন কার্য্যের ভার নিয়ে এসেছেন। তাঁর তাঁবু ছাত্রদের তাঁবু থেকে একটু

দূরে—একটুখানি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আছে, যদিও 'ক্যাম্পলাইফে' সে স্বাতন্ত্র্যের কোন অর্থ নেই বা প্রফেসরও তা' চান না। নিতান্তই ছেলেদের উৎসাহের প্রাধান্যে তাঁর স্বাভাবিক পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্যই এই সামান্য একটু প্রয়াস তাঁর। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত একাকী পড়াশুনা করা তাঁর বহুদিনের প্রিয় অভ্যাস।

খনন কার্য্যে এখনও উল্লেখযোগ্য কিছু না পাওয়া গেলেও প্রফেসরের ধারণা এখানে একটা বিরাট প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাবেই—হয়তো সেজন্যই তাঁর উদ্বেগ ও অস্থিরতা কয়েকদিন ধরেই একটু বেড়েছে। ছাত্রেরাও তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ রকমের গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণতঃ গম্ভীর প্রকৃতির লোক হলেও প্রফেসর ছাত্রদের কাছে খুব সহজলভ্য ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাধারণভাবে হাসিগল্প করা তাঁর প্রিয় আনন্দ ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ প্রফেসর একটু বেশী রকম গম্ভীর হয়ে পড়েছেন—বিশেষ কারুর সঙ্গেই তাঁর কথাবার্ত্তা নেই। এমন কি খনন কার্য্যের ফলাফলের দিকেও তেমন তীক্ষ্ণ মনোযোগ নেই বলে ধরা পড়েছে ছাত্রদের চোখে। শরীর অসুস্থতার কথা কেউ কেউ সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিল কিন্তু অধ্যাপক তাদের মাথা নেড়েই ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এই কথাটাই ভাবছিলেন প্রফেসর গুপ্ত—ভোরবেলায় বাইরে

ইজিচেয়ারে বসে। সারারাত্রি অনিদ্রায় চোখের কোণে কালির রেখা—চোখ দুটি ঈষৎ রক্তিমাভ। চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবছিলেন বিচিত্র এক কথা। গত সাতদিন ধরে প্রফেসর এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখছেন। গৈরিক পরিহিত এক বৌদ্ধ ভিক্ষু—মুণ্ডিত মস্তক—হাতে ভিক্ষাপাত্র আর দণ্ড, প্রতিদিন স্বপ্নের মধ্যে এসে দেখা দেয় প্রফেসরকে। একটা জিনিষ বিশেষ করে প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—সে হ'ল ভিক্ষুর বিষণ্ণ মুখচ্ছবি—তার সজল নয়নপ্রান্ত। বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রশান্তি কোথাও নেই। ভিক্ষুর মুখে শুধুই অনুশোচনার বেদনাময় প্রতিচ্ছবি। প্রফেসারের চোখে ঘুম আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভিক্ষুর আবির্ভাব ঘটে। নীরবে চেয়ে থাকে সে প্রফেসরের মুখের দিকে—কি যে তার বক্তব্য—কি সে বলতে চায়—কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না প্রফেসর। অথচ প্রতিদিন রাত্রে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছে। এমন অদ্ভুত অর্থহীন স্বপ্ন কেন তাঁকে প্রতিনিয়ত নিদ্রার ভিতরে এসে বিব্রত করে তুলছে—এর কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। আজ কতদিন হল এই ব্যাপার চলেছে। ফলে এখন রাত্রির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসরের এক অভূতপূর্ব্ব আতঙ্কের সৃষ্টি হতে থাকে মনের ভিতরে। প্রতিক্ষণেই তাঁর ভয় হতে থাকে কখন আবির্ভাব হবে সেই ম্লানমুখ বেদনাকাতর বৌদ্ধ ভিক্ষুর। নির্ব্বাক অধরের

অনুচ্চারিত ভাষা তার যেন ক্রমশঃই শব্দময়ী হয়ে উঠতে চায়—সেই নির্ব্বাক মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে অবশেষে সহসা প্রফেসর জেগে ওঠেন। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ তাঁর সিক্ত হয়ে গেছে—পিপাসায় শুকিয়ে গেছে সমস্ত বুক। বাইরের অরণ্যে অরণ্যে নিস্তব্ধ রজনীর ভাষা শব্দময়ী হয়ে উঠেছে তখন বাতাসের স্পর্শে। ভিক্ষু কি তারই ভাষা রেখে গেল তাদের কাছে? ক্রমে প্রফেসর অনুভব করতে সুরু করেছেন যে দিনরাত্রে সব সময়েই ভিক্ষু তাঁর পাশে পাশে থাকে। কখনও একটি ক্ষণের জন্যও তাঁকে ছেড়ে সে কোথাও যায় না। দিনের আলোয় তার ছায়ামূর্ত্তি চোখে পড়ে না—কিন্তু এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁকে সেই ভিক্ষুর উপস্থিতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সচেতন করে রাখে। প্রফেসর গুপ্ত ভাবপ্রবণ লোক নন—অশরীরি কিছুতে তাঁর আস্থা নেই—প্রত্যেকটি ব্যাপারকেই তিনি বিজ্ঞানের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে নিতে চান। বিজ্ঞান যাকে স্বীকার করে না প্রফেসরের তাতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু এই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের ব্যাপারকে কোন কিছু দিয়েই তিনি সমর্থন করে নিতে পারছেন না। কোনও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারছে না। ফলে সাতদিনের একটা অর্থহীন ব্যাখ্যাহীন ব্যাপারে প্রফেসারের মনের ভারসাম্য ক্রমেই আসছে নষ্ট হয়ে—বুদ্ধিকে পরাস্ত করে মনটা একটা অবিশ্বাস্য কিছুকে মেনে নিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে—

কিন্তু রাত্রের নির্জ্জনতায় যে দুর্ব্বলতা তাঁকে পেয়ে বসে, গভীর নির্জ্জন অরণ্যসমাকুল আদিম প্রকৃতির কাছে বশ্যতা স্বীকারের যে মনোভাব তাঁর ভিতরে দেখা দেয়—দিনের আলোয় বুদ্ধিসর্ব্বস্ব—জ্ঞানী প্রফেসর গুপ্ত তাকে সবলে অস্বীকার করতেই চান নিছক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ভেবেই। ফলে ২।৪টে টনিকের ব্যবস্থা—সারাদিন অপরিসীম পরিশ্রমের ক্লান্তি, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস কিংবা সন্ধ্যার সময় শুয়ে পড়া—কোনটাই তিনি বাকী রাখলেন না। কিন্তু সুফল তাতে কিছুই ফলল না—বৌদ্ধ ভিক্ষুর আকুতিভরা আবেদনের হাত তিনি এড়াতে পারলেন না।

এই কথাই ভাবছিলেন প্রফেসর সকাল বেলায় চোখ বুজে, ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তিনি। কাল সারারাত্রি তাঁর ঘুম হয়নি একটুও। চোখ বন্ধ করা মাত্রই সেই ভিক্ষু এসে দাঁড়িয়েছে বারে বারে তাঁর কাছে। জেগে জেগেই তিনি অনুভব করেছেন ভিক্ষুকে। তাঁর বুদ্ধি দিয়ে মন দিয়ে সমস্ত দিয়েই তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এই অশরীরি ভিক্ষুর অনুতপ্ত আত্মা কোনও এক অনির্দ্দেশ্য কারণের প্রতিকারের জন্যই তাঁর কাছে আসে। কিন্তু কি সে প্রার্থনা—কেমন করে প্রফেসর তাঁর প্রতিবিধান করবেন—কে তাঁকে পথ দেখাতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা তাঁর ছাত্রদের কাউকে কাউকে বলবেন ভেবেছিলেন কিন্তু তাতে তাঁর পদমর্য্যাদায় বেধেছে। প্রফেসর

গুপ্ত সেন্টিমেন্টাল একথা আড়ালেও কেউ বলবে এ তাঁর কাছে অসহ্য।

বেলা বাড়তে লাগল।—প্রফেসরের ভৃত্য এসে সংবাদ দিল স্নানের জল তৈরী। ক্লান্ত দেহে তিনি উঠে কামরার ভিতরে গেলেন।

সেইদিন দ্বিপ্রহর বেলা। প্রখর রৌদ্রে পৃথিবীর বুকে আগুণ ধরে গেছে। তবু তারই মাঝে চলেছে কুলিদের খনন কার্য্য—ছাত্রদের কোলাহলের টুকরো টুকরো অংশ ভেসে আসছে প্রফেসরের ক্যাম্পে। সহসা রৌদ্রতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ছুটে এল প্রফেসরের প্রিয় ছাত্র—হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্ল স্যার! একটিবার আসতে হবে আপনাকে। কয়েকটি দামী জিনিষ পাওয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে। প্রফেসর দ্রুত মাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন দামী জিনিষই বটে। তার মধ্যে আছে তথাগতের ধর্ম্মচক্র, সপ্তরত্ন, ভিক্ষুর দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র ইত্যাদি—আরও দেখা গেল আছে এমন সব চিহ্ন যা থেকে বোঝা যেতে পারে যে এখানে একটা বৌদ্ধ বিহার ছিল। হয়তো প্রাচীন দিনে তার সমৃদ্ধি ছিল ভারত বিখ্যাত। প্রাপ্ত জিনিষগুলি ভাল করে দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল অনেকখানি, কিন্তু এমন কোন চিহ্ন বা লিপি পেলেন না প্রফেসর যা' থেকে বৌদ্ধ বিহারের কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। তখন

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, প্রফেসর জিনিষগুলো তাঁর বসবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবার কথা বলে ক্যাম্পের দিকে ফিরলেন ঠিক সেই সময়েই কুলিদের মধ্যে একটা চীৎকার শুনে ফিরে দাঁড়ালেন—তিনি দেখলেন—একজন কুলির হাতে ছোট একটা পেটিকা—সম্ভবতঃ লোহার হবে। প্রফেসর থমকে দাঁড়িয়ে কুলীদের হাত থেকে সেটা তুলে নিলেন—একজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট ভারী। কি আছে ওর ভিতরে—কোন অজ্ঞাত যুগের অনাবিস্কৃত ইতিহাস? কোন স্বর্ণময় যুগের অপূর্ব্ব কাহিনী অথবা ষড়যন্ত্রের কোন নির্ম্মম নিদর্শন! উত্তেজনায় প্রফেসরের সমস্ত মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল—ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সাড়া। প্রফেসর তাদের সবার দিকে একবার চাইলেন—তারপরে সেটাকে নিজের সবল দু বাহুতে বহন করে দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। শুক্লপক্ষ চলেছে—তিথি বোধহয় দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী। অবারিত রজত জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে গেছে অরণ্য সমাকুল বিন্ধ্যপর্ব্বত। বাইরে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন প্রফেসর। চোখে তাঁর বিশ্বের ঘুম ভীড় করে এসেছে। কিন্তু মনের মধ্যে আতঙ্কের সাড়া। পাশেই অপেক্ষা করে আছে সেই ভিক্ষুর উন্মুখ আত্মা—নিদ্রার আড়ালে আড়ালে আসবে তাঁর কাছে। চোখের জলে, নির্ব্বাক অধরে তার যে অনুচ্চারিত ভাষা

তাকে কেমন করে রূপ দেবেন প্রফেসর! একি এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটছে প্রতিদিন তাঁর জীবনে?

চমকে উঠে বসলেন প্রফেসর—তিনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? কই না তো? চিন্তাধারা তাঁর একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও তো ব্যাহত হয়নি। ঐ জ্যোৎস্নাধারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যার কথা ভাবছিলেন—আজ এতদিন পরে সেই কি দেখা দিয়ে গেল তাঁকে তাঁর প্রত্যক্ষ চেতনার মাঝে! কিন্তু এ কি পরিবর্ত্তন? ভিক্ষুর সেই বিষণ্ণভাব কোথায় অপসারিত হয়ে গেছে—সফলতার আনন্দে মুখ তার উজ্জ্বল—সজল চোখের মাঝে আনন্দের জ্যোতি—সর্ব্বদেহে এক আসন্ন সার্থকতার আনন্দবার্ত্তা। একটিমাত্র মুহূর্ত্ত। তারপরেই মিলিয়ে সে গেল। সচকিতে প্রফেসর উঠে দাঁড়ালেন। এ কি অস্বস্তিকর অনুভূতি—সমস্ত মনটা একটা অব্যক্ত ক্রন্দনে কেন ছেয়ে আসে? সেই জ্যোৎস্নামণ্ডিত প্রান্তরের দীর্ঘ ঘাসবনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন প্রফেসর। সমস্ত অন্তরকে বিমথিত করে যেন কেবল এই কথাটিই মাত্র জাগে—ওগো ভিক্ষু! বিপুলা পৃথ্বী তার সসাগরা ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার যাঁর চরণপদ্মে সমর্পণ করে পরম সার্থকতা লাভ করেছিল—তুমি তাঁরই ধর্ম্মের ছায়াতে পরিপুষ্ট হয়েও কেন শান্তি পেলেনা—কেন আজ শতাব্দী ধরে কেঁদে বেড়ায় তোমার বেদনাবিহ্বল চিত্ত!

নিস্তব্ধ রাত্রি! দিনের আলোয় যে প্রান্তরভূমি ছাত্রদের কোলাহলে মুখরিত—কুলিদের শাবল আর গাঁইতির শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—সেখানে এখন আদিম স্তব্ধতা। ধরিত্রী সে শান্ত পরিবেষ্টনীর মাঝে অনিমেষে জেগে থাকে আপন নিদ্রিত সন্তানের শিয়রে। ঊর্দ্ধে দেবতার পানে তার শঙ্কিত মাতৃআঁখি সন্তানের সকল অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করে, বলে—কুশলে থাক তোরা। তোদের আঘাতে আঘাতে বুক আমার জর্জ্জরিত হয়ে গেল—তোদের অনাবশ্যক অহেতুকী কৌতুহলের জন্য কত অন্যায়ের সৃষ্টি হয় তাকি জানিস ওরে অবোধের দল! আমার বুকের মাঝে যাদের লুকিয়ে রাখি কেন বাইরে আনার আকিঞ্চন তাদের!

সারি সারি ক্যাম্পগুলো চাঁদের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ছাত্রেরা সারাদিনের গভীর পরিশ্রমের পরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। কেবলমাত্র প্রফেসরের ক্যাম্পে আলো জ্বলছে। নীল আলোটা শেডের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে টেবিলের পরে। চেয়ারে বসে আছেন প্রফেসর। হাতের পাশে তাঁর সেই ছোট লৌহ পেটিকা। প্রফেসরের চোখে ঘুম নেই। বিছানাকে রীতিমত ভয় করতে সুরু করেছেন তিনি। হাতে বিশেষ কাজ নেই, মনটাকে অন্যমনস্ক করে রাখার জন্য তিনি পেটিকাটিকেই খোলার ব্যবস্থা করছেন। পকেটের ভিতর থেকে

স্ফটিক পাত্র

একটা অদ্ভুত দর্শন লোহার চাবী বের করে একটু চাপ দিতেই বাক্সের চাবীটা গেল ভেঙ্গে—প্রফেসর ডালা তুলে ধরলেন। কত শতাব্দীর আগেকার কথা কে জানে—চারিদিকে মরচে পড়ে গেছে। সেই সামান্য শব্দেই ক্যাম্পের প্রশান্তি ভেঙ্গে গেল। অজ্ঞাতসারেই প্রফেসর চমকে উঠলেন—ডালা তুলে দেখলেন—তার ভিতরে চমৎকার গঠনের একটা চন্দন বাক্স। সন্তর্পণে তুলে নিলেন তাকে আপন হাতে। অপরূপ কারুকার্য্যখচিত বাক্স। ডালার উপরে তথাগতের প্রসন্নমূর্ত্তি খোদিত। নীচে পালিভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে উৎকীর্ণ—

বুদ্ধ! ক্ষমতু মে ভবান্।

প্রফেসর পড়লেন। অকারণেই সজল হয়ে এলো তাঁর চোখের প্রান্ত। কি সুন্দর কথা কয়টি। কি অপরূপ মাধুর্য্যে ভরা—কি সুগভীর আশ্বাসে ভরা। এমন করে অন্তরের থেকে উচ্চারিত ক্ষমা প্রার্থনা কি বিফলে যায়!

চন্দন বাক্সটি অত্যধিক ভারী অথচ খুলবার কোনও উপায় পাওয়া গেল না। নাড়াচাড়া-করতে করতে কখন প্রার্থনার অক্ষরের পরে আঙ্গুলের চাপ পড়তেই বাক্সের মুখ খুলে গেল। কম্পিত হাতে প্রফেসার ডালা তুলে ফেল্লেন—ভিতরে একি? একটি স্বচ্ছ স্ফটিকের পাত্রে পরিপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা। পাত্রটির অদ্ভুত গঠনকার্য্য—সাধারণ পাত্র থেকে বেশ কিছুটা তফাৎ আছে।

টেবিল ল্যাম্পের আলো সেই স্বর্ণমুদ্রা ভরা স্ফটিক পাত্রের পরে প্রতিফলিত হয়ে ঝক ঝক করে জ্বলে উঠল। সন্তর্পণে প্রফেসর একটি স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিলেন—ল্যাম্পের আলোয় তার পাঠোদ্ধার করে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। স্বর্ণমুদ্রা সম্রাট অশোকের নামাঙ্কিত—তাঁরই রাজ্যকালের সন এবং তারিখ বহন করছে। এত পুরাণো এই সভ্যতা? কিংবা পরবর্ত্তীকালের কোনও শ্রেষ্ঠির সঞ্চিত এই ধনসম্ভার? কেমন করে জানা যাবে এই ঐতিহাসিক তথ্য। এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি যদি কথা কইতে পারতো—বলতে পারত সে যুগের কাহিনী!

রাত্রি গভীরতর হয়ে চলেছে। কালের প্রহরী আপন অশ্রুত-শঙ্খধ্বনিতে রাত্রির মধ্যযাম ঘোষণা করলেন। প্রকৃতির আপন অঞ্চলের সন্তান বন্য বিহগকুল বুঝি সেই অশ্রুতধ্বনি শোনে—তারা কলরব করে উঠল—। রাত্রির স্তম্ভিত চেতনা চকিত হয়ে উঠল সেই ক্ষণে। প্রফেসর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্ফটিকপাত্র আর তার স্বর্ণমুদ্রাগুলি তাঁর ক্লান্ত মস্তিষ্কের পরে বড় বেশী চাপ দিয়েছে। তিনি আর নিজেকে বহন করতে পারছিলেন না। ঘুমে চোখ বুজে আসছে—আলোর শেডটা ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। নিস্তব্ধ ক্যাম্প! প্রফেসরের নিদ্রিত চেতনার মাঝে এসে দাঁড়াল এক ভিক্ষু। গৈরিকে আবৃত দীর্ঘ দেহ, আয়ত নয়নে অশ্রুজল,

নির্ব্বাক অধরে বেদনার আভাষ! আহত বেদনায় প্রফেসর প্রশ্ন করলেন—কি চাও তুমি আমাকে বল। নিঃশব্দে সম্মুখের দিকে হস্তপ্রসারণ করে ভিক্ষু প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—তারপরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল চোখের সম্মুখ থেকে। প্রফেসর সম্মুখের দিকে চাইলেন—

অতীতের এক বিশাল রাজপথ—দুপাশে প্রাচীন বিপুল বনস্পতির সারি। রঙ্গীন নিশান আর পত্রপুষ্পে সজ্জিত তোরণ, রঙ্গীন বেশভূষাধারী নাগরিকদের স্রোত চলছে সেই পথ বেয়ে। সম্মুখে অপরূপ দারুময় রাজপ্রাসাদ—তার চারুকৌশলের সীমা নেই, প্রফেসর বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে—জন্মান্তরের কোনও আনন্দমুখরিত প্রভাতে এদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কি? হৃদয়বৃত্তির কোনও নিগূঢ় সম্পর্ক? উৎসব মুখর জনতা সেই প্রাসাদদ্বারে আনন্দে ভীড় জমিয়েছে—সম্মুখে বিশাল রাজসভাগৃহ। রত্নসিংহাসন রাজছত্র সবই শিল্পকলা ও প্রাচুর্য্যের অপরূপ মহিমাময় নিদর্শন। পায়ে পায়ে প্রফেসর সভাগৃহের একপাশে এসে দাঁড়ালেন। সিংহাসনের নীচে দণ্ডায়মান এক ভিক্ষু, গৈরিকাবৃত তাঁর সুন্দর দীর্ঘ তনুদেহ, নয়নে করুণার অনুচ্চারিত ভাষা, মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে ভিক্ষাপাত্র। পদতলে নতজানু বসে কে ঐ? ললাটে রাজচক্রবর্ত্তীর প্রদীপ্ত শিখা, বাহুতে অজস্র শক্তি, কিন্তু নয়নে

অমন বেদনাভরা অনুতাপ কেন? দণ্ডায়মান ভিক্ষু প্রসারিত করে দিলেন ভিক্ষুর গৈরিক চীর আর ভিক্ষাপাত্র সেই নতজানু পুরুষের হাতে—শান্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ত্রিশরণ মন্ত্র—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

দীক্ষিত পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন সেই অমৃত গাথা। অপসারিত হয়ে গেল তাঁর মুখের কালিমা প্রসন্ন জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর সর্ব্বাঙ্গ। সমবেত জনতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল—প্রিয়দর্শী অশোকের জয়, জয় ভগবান উপগুপ্তের। চমকে উঠলেন প্রফেসর। কোন যাদুবিদ্যার বলে তিনি সম্রাট অশোকের দীক্ষা গ্রহণ উৎসবে এসে উপস্থিত হয়েছেন—এই সম্রাট অশোক? আর ঐ সেই করুণাময় বৌদ্ধস্থবির উপগুপ্ত! তারপর ও কী? দীক্ষিত অশোক গুরুদক্ষিণা দিচ্ছেন—স্ফটিক পাত্র ভরা সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ধীরে ধীরে অর্পণ করলেন উপগুপ্তের হাতে। আবার জয়ধ্বনি করে উঠল জনতা। কিন্তু কোথায় দেখেছেন ঐ স্ফটিক পাত্র প্রফেসর—অমনই স্বর্ণমুদ্রায় ভরা—কোথায়? কখন? মানসিক অশান্তিতে প্রফেসর বিছানার পরে উঠে বসলেন—উঃ কী স্বপ্ন! কি বিচিত্র! শেডের মৃদু আলোয় জ্বলছে স্ফটিক পাত্র আর

তার স্বর্ণ মুদ্রাগুলি। অমনই অসতর্কভাবে রেখেই প্রফেসর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বটে। কিন্তু এই কি তবে সম্রাট অশোকের প্রদত্ত গুরুদক্ষিণা? এত শতাব্দী অতিক্রম করে অবশেষে তাঁর কাছে এসে পৌঁছল সেই পরম পুণ্যময় দিনের সৌগন্ধ বহন করে। একী অপরূপ আশীর্ব্বাদ বিধাতার তাঁর পরে। কোন লোকোত্তর পুণ্যের ফলে এমন দুর্লভ ধন এসেছে তাঁর হাতে! কিন্তু নেশার মত জড়িয়ে আসছে ঘুম—চোখ মেলতে আর পারছেন না তিনি—

বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ হচ্ছে। বিশাল শ্যামল অরণ্যানি কেটে ফেলে তৈরী হল চৈত্য। দিনে দিনে সম্পূর্ণসুন্দর হয়ে ওঠে—স্থাপত্য শিল্পের অপরূপ নিদর্শন! বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্ত প্রতিষ্ঠা করবেন তথাগতের কারুণিক মূর্ত্তি। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় হবে চৈত্যের প্রতিষ্ঠা। চৈত্যের পাশেই নির্ম্মিত হয়েছে সঙ্ঘারাম—ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আশ্রম। শান্ত সমাহিত সুন্দর তাঁদের জীবনযাত্রা—কল্যাণময় তাঁদের জীবনের পথ—মহত্তম তাঁদের জীবনের ব্রত। সঙ্ঘে আয়োজন চলেছে—আগামী বৈশাখের উৎসবের জন্য ব্যস্ত ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীরা। নির্ব্বাণ এসেছে সঙ্ঘারামে। অতি অল্পদিন হল সে সঙ্ঘের আশ্রয় চেয়েছে—সংসারে তার নেই কোন স্পৃহা। ভগবান বুদ্ধের শান্তির ছায়ায় আশ্রয় কামনা করে সে। আগামী

বৈশাখী পূর্ণিমায় তার দীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে—সেইদিন উপগুপ্ত নির্ব্বাণকে উপসম্পদা দান করবেন। সঙ্ঘে একাকী দিনযাপন করে নির্ব্বাণ—তার কোনও সঙ্গী নেই। বিষণ্ণতায় তার মনের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত ঢাকা। মধ্যাহ্নে রৌদ্রতপ্ত উদাস প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তার মন বেদনায় ভরে ওঠে। মনে পড়ে ফেলে আসা সুখে দুঃখে জড়ানো মাটির ঘর, মায়ের স্নেহ, সুনন্দার প্রেম, শতবাহু প্রসারণ করে ব্যাকুল মন কেন ছুটে যায় তাদের দিকে? আবার তখনই দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে তার মন ফিরে আসে নিজের কাছে। দারিদ্র্যের কি অপমান-জনক অনুভূতি—সংসারের কাছে, সমাজের কাছে কি তীব্র উপহাস। প্রয়োজন নেই তার সে সংসারে যেখানে ভালবাসা কাঞ্চনমূল্যে বিক্রীত হয়! কিন্তু সত্যই কি তাই! সত্যই কি কাঞ্চনমূল্যে সব বিক্রীত হয়? তবে শ্রেষ্ঠ ধনীকন্যা সুনন্দা তাকে ভালবেসেছিল কি করে? কিসের আশায়? তার ধনী-পিতার সেই অপমান সে মুছে নিতে এসেছিল তার আপন অন্তর মাধুর্য্যে—কিন্তু নির্ব্বাণ ফিরে তাকায়নি—নিদারুণ বিতৃষ্ণা অপরিসীম অপমান বোধ তাকে তখন অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছিল। সে ফিরে তাকায়নি সংসারের দিকে—চলে এসেছে সংসার থেকে অনেক দূরে সন্ন্যাসের পথে। এই ভাল, এই সুন্দর, এই তার জীবনকাম্য। কিন্তু সত্যই কি তাই? মনের নিভৃতে কেন

তবে জাগে সুনন্দার মুখ ! কেন চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে আসে ? মনে মনে আবৃত্তি করে চলে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

তথাগতের মহাকারুণিক প্রসন্নমুখে নীরব আশ্বাস !

কাল বৈশাখী পূর্ণিমা ! আজ সারারাত্রিব্যাপী তারই উৎসব আয়োজন। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের সম্মিলিত কর্ম্মপ্রণালী উৎসবকে সার্থক সুন্দর করে তুলবার চেষ্টায় ব্যগ্র। নির্ব্বাণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়, কোন কাজেই বসে না তার মন। গভীর রাত্রি, আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ—অজস্র জ্যোৎস্না-ধারা তথাগতের করুণার মত মাটির পৃথিবীর বুকে ঝরছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে নির্ব্বাণের মনে বিশ্বের ক্রন্দন ভীড় করে এলো। সঙ্ঘারামে তখন কর্ম্মক্লান্ত ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা নিদ্রায় অভিভূত। নির্ব্বাণ ধীরে ধীরে সঙ্ঘারাম ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। কিছুদূরে চৈত্য—চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত তার শুভ্র শিখর। মোহগ্রস্তের মত সেদিকে নির্ব্বাণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল—ধীরে ধীরে নির্ব্বাণ অগ্রসর হতে লাগল চৈত্যের দিকে।

ধীরে ধীরে চৈত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে নির্ব্বাণ এসে প্রবেশ করল গর্ভগৃহে। যেখানে স্থাপিত অমিতাভের করুণাময় মূর্ত্তি—

প্রসন্ন সুন্দর। পাশে অনির্ব্বাণ ঘৃতের প্রদীপের শিখা—আলো অন্ধকারের ছায়ায় সেই নির্জ্জন চৈত্য নির্ব্বাণের বেদনাকাতর মনকে বিমোহিত করে তুলল। ঝর ঝর করে ঝরতে লাগল তার দুই চোখের ধারা—কে বলে দেবে কোন পথ তার সত্য? আজ নিশাশেষে উপসম্পদা-গ্রহণের পুণ্যদিন—কিন্তু সংসার-বিরাগীর মনে আজও কেন ছোট ছোট হাসি খেলা, মান অভিমানের দ্বন্দ্ব? কেন সেই ফেলে আসা নির্জ্জন আম্রচ্ছায়া মাখানো মাটির গৃহ প্রাঙ্গণ তাকে ডাকে? বুদ্ধের চরণের তলে ঝরতে লাগল তার ব্যথিত হৃদয়ের জমাট বেদনা। অবশেষে একসময়ে অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলে নির্ব্বাণ চাইল—প্রভু তথাগতের মুখের দিকে—কিন্তু ওকী? প্রভুর প্রসারিত করপদ্মে ওকী? মৃদু প্রদীপের আলোকে ঝলমল করছে। স্ফটিকপাত্রে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা! নির্ব্বাণের চোখে ও কিসের আলো? মারের কোন্ প্রলোভন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এসে দাঁড়িয়েছে নবীন তাপসের চোখের সম্মুখে? হে মারবিজয়ী তথাগত! রক্ষা কর! শরণাগতকে আশ্রয় দাও—অভয় দাও হে চির-শরণ।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে কে ঐ একাকী যাত্রা করল? বাইরের অফুরন্ত জ্যোৎস্না কেন ম্লান হয়ে আসে? প্রকৃতির চোখে কিসের বেদনা?

স্ফটিক পাত্র

সঙ্ঘারামে সদ্যজাগ্রত সন্ন্যাসী উপগুপ্তের গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

বুদ্ধো ! ক্ষমতু মে ভবান্

হে গোপনচারী পথিক ! তুমি কেন থামালে তোমার গতি ? তোমার মনেও কেন ধ্বনিত হতে থাকে ঐ একই প্রার্থনা—

বুদ্ধো ! ক্ষমতু মে ভবান্

কিন্তু কণ্ঠ কেন সাড়া দেয় না ?

দৃশ্যপট বদলে গেছে নিদ্রিত প্রফেসরের চোখের সম্মুখে—অন্ধকার রাত্রি—নিদ্রিত সঙ্ঘারাম—কেবল থেকে থেকে প্রহরী ঘোষণা করছে রাত্রির প্রহর। ও কে শীর্ণ পথিক—জীর্ণ গৈরিকে আবৃত তার ক্লান্ত তনু। অন্ধকারকে ভেদ করে জাগছে তার মুখে অনুতাপের বেদনা। অস্পষ্ট প্রার্থনায় কাঁপছে তার শুষ্ক ওষ্ঠাধর। সেই মৃদু কণ্ঠস্বর এসে পৌঁছোল প্রফেসরের কানে—বুদ্ধো ! ক্ষমতু মে ভবান্। সঙ্ঘারামের পিছনে খরস্রোতা নদী—সঙ্ঘারামের ভিত্তিগাত্র স্পর্শ করে চলেছে তার স্রোত—মৃদু কল্লোলধ্বনি শোনা যায় তার। ভিক্ষু এসে দাঁড়াল সেই নদীর তীরে—ধীরে ধীরে এসে নামল জলের ভিতর। খরস্রোতা নদীর বুকে সন্তর্পণে ও কি নামিয়ে দিল গভীর মমতায় ? কিন্তু ও কেন আর উঠল না নদীগর্ভ থেকে ?

হে অনুতপ্ত ভিক্ষু! আপন চিত্তশুদ্ধি করা সে কি এইভাবে—এমন করে আত্ম-অবমাননার আত্মহত্যায়?

আবার নেমে এলো গভীর কুয়াশা—এবার প্রফেসর যাত্রী কোন সুদূর তীর্থের উদ্দেশে—সঙ্গে সেই ভিক্ষু তাঁকে পথ দেখিয়ে চলেছে—নিবিড় অরণ্যসমাকুল পথ, দিনের আলো প্রবেশ পথ খুঁজে মরে সেখানে। অন্ধভাবে ভিক্ষুকে অনুসরণ করে চলেছেন তিনি। অরণ্যের মাঝে ভগ্ন দেউল—ভিক্ষুর নির্দ্দেশ লক্ষ্য করে প্রফেসর সেই দেউলে প্রবেশ করলেন। ভগ্ন দেউল—ভগ্ন অলিন্দ পার হয়ে অবশেষে এলেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। প্রফেসর অবাক বিস্ময়ে দেখলেন গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি। পাশে অনির্ব্বাণ প্রদীপ মৃদু আলো বিকীর্ণ করছে। দক্ষিণ হস্তে তাঁর বরাভয়—প্রসারিত বাম হস্তে—ওকি—ভিক্ষাপাত্র কই? শূন্য হস্তের পানে তাকিয়ে হতবুদ্ধির মত প্রফেসর দাঁড়িয়ে রইলেন—অমিতাভের পায়ের নীচে নতজানু হয়ে বসল সেই ভিক্ষু—চোখ দিয়ে তার ঝরছে অবিরল জল—অভিভূতের মত প্রফেসরও বসে পড়লেন সেখানে। ভিক্ষুর কম্পিত অধর থেকে প্রার্থনার ভাষা কি শুনতে পেলেন প্রফেসর? সহসা কার কণ্ঠস্বরে প্রফেসর চকিত হয়ে উঠলেন—জেগে দেখলেন অজ্ঞাতসারেই তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে—

বুদ্ধো! ক্ষমতু মে ভবান্

কম্পিত দেহে প্রফেসর উঠে বসলেন। বাইরে উষার প্রথম আভাস। কলকণ্ঠে বিহগেরা কি বলে? প্রফেসরের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে কলরব প্রার্থনার মতই শোনাল—

বুদ্ধো! ক্ষমতু মে ভবান্

নিখিলবিশ্বে একি আবেদন? বুদ্ধো! ক্ষমতু মে ভবান্—হে প্রভু তথাগত ক্ষমা কর—লোভের মোহে পৃথিবী জর্জ্জরিত, ক্ষমা কর তার দুর্ব্বলতা, তোমার বরাভয় কর প্রসারিত কর—বিপন্না ধরিত্রীকে ক্ষমা কর তুমি। সারাদিন প্রফেসরের কেটে গেল উন্মনাভাবে। কোথায় কোন্ মহারণ্যে প্রতীক্ষায় আছেন অমিতাভ! কেমন করে তাঁকে প্রত্যর্পণ করবেন প্রফেসর এই স্বর্ণভরা স্ফটিকপাত্র। কেমন করে এই অনুতপ্ত ভিক্ষুর জীবনের গ্লানিকে তিনি মুছে নেবেন, যার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে তার অবর্ণনীয় বেদনার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে? কে তাঁকে দেখাবে পথ—কে তাঁকে নিয়ে যাবে প্রভু তথাগতের কাছে?

সারাদিন অতিবাহিত হয়ে গেল অস্থির আর উন্মনাভাবে। ছাত্রদের দল খবর নিতে এসে ফিরে গেল। ক্যাম্পের ভিতরে অস্থিরভাবে পায়চারী করে বেড়ালেন তিনি। রাত্রি নেমে এল, নির্জ্জন একাকী রাত্রি, আকাশে অখণ্ড জ্যোৎস্না। অন্যমনস্ক-ভাবে চাইলেন প্রফেসর আকাশের দিকে, রজত জ্যোৎস্নাধার

চন্দ্র! কি সুন্দর! কি তিথি আজ? কি মাস? বৈশাখ মাস? তবে কি পূর্ণিমা? ত্রস্তভাবে ডায়েরী খুলে ফেল্লেন তিনি—না না আজ ত্রয়োদশী—পরশু পূর্ণিমা—এখনও সময় আছে—হে তথাগত পথ দেখিয়ে দাও—বহুশতবর্ষ আগে এক বৈশাখী পূর্ণিমাতে যে স্ফটিকপাত্র তোমার 'করপদ্ম থেকে অপসারিত হয়েছিল আজ শত শত বৎসর পরে সেই স্ফটিকপাত্র তোমার করপদ্মে নিবেদন করার সৌভাগ্য দান কর।

প্রফেসরের মুদিত চোখ থেকে ঝর ঝর করে পড়তে লাগল জল। ধীরে ধীরে বিশ্বজগৎ লুপ্ত হয়ে গেল তাঁর স্মৃতিপথ থেকে, এলো সেই ভিক্ষু, ইঙ্গিতে প্রফেসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে তার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে দিল প্রান্তরের পূর্ব্ব সীমান্তে যেখানে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাষাণ দেহ আবৃত করে জেগে উঠেছে বিপুল শ্যামল অরণ্যানী। ভিক্ষু মিলিয়ে গেল। তন্দ্রা ভেঙ্গে জেগে উঠলেন প্রফেসর, ক্যাম্পের বাইরে এসে তাকালেন পূর্ব্ব সীমান্তে। বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা ভেসে উঠল তাঁর মনে, তাই কি হতে পারে না? সে কি এতই অসম্ভব? ধীরে ধীরে প্রফেসরের মনে পড়ল খননকার্য্যের ফলে আজ পর্য্যন্ত যা আবিষ্কার হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এখানে বহুদিন অতীতে গড়ে উঠেছিল এক সঙ্ঘারাম, স্রোতস্বতী

নদীর চিহ্নও পাওয়া গেছে এখানে। কে বলতে পারে উপগুপ্ত স্থাপিত এই সেই বৌদ্ধ বিহার কিনা। নদীতে নিক্ষিপ্ত লৌহ পেটিকাটিও তো এখানেই পাওয়া গেছে। কোথায় সেই চৈত্য ? তবে যেখানে অপেক্ষায় আছেন প্রভু তথাগত সে কি ঐ পূর্ব্বপ্রান্ত ঘেঁষা অরণ্যে নয় ? হতে পারে না ? কে বলে দেবে তাঁকে সত্যপথ ?

পরদিন প্রভাতে ক্যাম্পে সাড়া পড়ে গেল, প্রফেসরকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁর কাপড় জামা জুতা সবই পড়ে আছে কেবল নেই প্রফেসর, সমস্তদিন অপেক্ষা করার পরে তারা নিকটবর্ত্তী থানায় ডায়েরী করে এল প্রফেসরের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে।

পুরো দুইদিন ধরে চলেছেন প্রফেসর। নগ্নপদ, নগ্ন মস্তক, গায়ে একখানি উত্তরীয়। হাতে তাঁর সেই চন্দন পেটিকা, কোন নিরুদ্দেশের পথ চেয়ে তাঁর যাত্রা সুরু হয়েছে। একাকী তবুও তিনি সঙ্গীহীন নন। সর্ব্বক্ষণই তিনি অনুভব করছেন শতাব্দীর সেই অনুতপ্ত উৎকণ্ঠিত আত্মা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় রাত্রের প্রথম প্রহরে প্রফেসর বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিবিড় অরণ্যের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। সহজ অবস্থায় দিনের আলোতে যে অরণ্য দুরধিগম্য, রাত্রের অন্ধকারে নির্ব্বিকার চিত্তে

পঞ্চ প্রদীপ

প্রফেসর প্রবেশ করলেন সেই ঘন অরণ্যে। বাম হাতে বৈদ্যুতিক আলো, তারই সাহায্যে পথ দেখে চলেছেন তিনি—কোথায় নিজেও কি জানেন তিনি ? অবশেষে একসময়ে পায়ে কঠিন পদার্থের সঙ্গে আঘাত লাগল—টর্চ্চের আলো ফেললেন প্রফেসর। এই তো সেই স্বপ্নদৃষ্ট ভগ্ন দেউল বৌদ্ধচৈত্য। কম্পিতপদে প্রফেসর ভগ্নদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন, ধীরে ধীরে অতিক্রম করলেন অলিন্দ, প্রাঙ্গণ, প্রার্থনা ঘর। অবশেষে সম্মুখে দেখা দিল গর্ভগৃহ। কি আছে এখানে—কোন অলৌকিক দৃশ্য ? টর্চ্চের শক্তিশালী আলো চারিদিকে ঘুরিয়ে নিলেন প্রফেসর। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত অতীত ভারতের গৌরবময় ইতিহাস কঠিন পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ। অবশেষে টর্চ্চের আলো এসে থমকে দাঁড়াল গৃহের ঠিক মধ্যস্থলে বিশাল সুন্দর ছত্রের নীচে ও কার প্রতিমূর্ত্তি ? পদ্মাসনে আসীন প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে বরাভয় মুদ্রা ! হে মহাকারুণিক ! কোন্ অতীত থেকে তুমি বসে আছ এখানে ? কার প্রতীক্ষায় ? থর থর করে কাঁপতে লাগল প্রফেসরের দেহ। কম্পিত হাতে অমিতাভের বামকরে তিনি স্থাপন করলেন স্বর্ণমুদ্রা ভরা সেই স্ফটিকপাত্র—বল্লেন হে রাজভিক্ষুক ! কি ভিক্ষা দেব তোমার ঐ প্রসারিত পদ্মকরে—কোন ঐশ্বর্য্য—কোন সম্পদ ? হে অভয় ! ঐ প্রসারিত বরাভয় করের আশ্রয় দান কর

স্ফটিক পাত্র

পৃথিবীকে—গভীরতম মর্ম্মবেদনার নিপীড়নে তার অন্তরের মর্ম্মকোষে যে রক্তশতদল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে সে তো তোমার যোগ্য আসন নয়—তোমার শুভ্র করুণার রঙে তাকে কর শ্বেতশতদল—আপন আসন তুমি গ্রহণ কর সেখানে। প্রলোভন থেকে মুক্ত কর নিখিল হৃদয়—রক্ষা কর তাকে অন্তরের দুর্ব্বলতা থেকে। নিখিল অনুতপ্ত চিত্ত প্রতিনিয়ত কেবল একই প্রার্থনায় মুখর—

বুদ্ধো! ক্ষমতু মে ভবান্

বনের প্রান্ত ছাড়িয়ে প্রফেসর যখন বাইরে এসে দাঁড়ালেন—দীর্ঘ বৃক্ষগুলির শীর্ষে শীর্ষে তখন কেবলমাত্র প্রত্যুষের আভাস—দিন দেবতার প্রথম আশীর্ব্বাদ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি—শুনতে পেলেন বহুদিন অতীত সেই বৌদ্ধযুগের শ্রমণ কণ্ঠের উষা সঙ্গীত—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

সেই অশ্রুত সঙ্গীতধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল কাননপ্রান্তর—প্রভাত আকাশ—শ্যামল অরণ্য—কঠিন পর্ব্বত।

প্রফেসর কাজে অবসর নিয়েছেন।

মঞ্জীর

জীবনে অনেক সময়ে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যাকে অলৌকিক আখ্যা দেওয়া চলে, সামান্য জিনিষ হঠাৎ অসামান্য বলে প্রতিভাত হয়। তাকে ভোলা সহজ নয়।

বড়দিনের ছুটিতে কলকাতার বদ্ধ হাওয়ায় মন আর টিকতে চাইল না—জবাব দিল। কাজেই ২৩শে রাত্রের গাড়ীতে পশ্চিমে রওনা হলাম একাই। জীবনে পিছুটান কিছু ছিল না—বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

দূর পশ্চিমের একটা জায়গায় এসে নামলাম। শীতের কুয়াসাভরা সন্ধ্যা তখন সমস্ত পৃথিবীর পরে ধোঁয়াটে চাদর টেনে দিচ্ছে। কোথায় যাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। ছোট্ট ষ্টেশন জনশূন্য হয়ে গেছে। ষ্টেশনমাষ্টারের ঘর থেকে

কেরোসিনের আলো দেখতে পেলাম। আস্তে আস্তে সেই দিকেই অগ্রসর হওয়া ছাড়া—উপায় কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু বৃথাই। আমার অসহায়ত্বকে ষ্টেশনমাষ্টার বুঝতে চাইলেন না। কিন্তু আমিও অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নই, তাঁকে বুঝিয়ে ছাড়ব। উদ্দেশ্য রাত্রের মত মাষ্টারমশাইয়ের ঘরে একটু স্থান করে নেওয়া, কিন্তু তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অজ্ঞাতকুলশীলকে ঘরে স্থান না দেওয়া। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বেরিয়ে এলাম। প্রবাসে বাঙ্গালী প্রীতি সম্বন্ধে যাঁরা উচ্ছ্বসিত তাঁদের এই ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে এই মুহূর্তেই পরিচিত করে দেবার একটা দুর্দম বাসনা হ'তে লাগল।

নির্ব্বিকার ভাবে পথ চলছি—পশ্চিমের ছোট সহর। নির্জ্জন হয়ে গেছে তার রাস্তা, দুপাশে সুদীর্ঘ ইউকালেপটিক গাছগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে তাদের গন্ধ—লেবুর গন্ধের মত মিষ্টি ঝাঁঝালো। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। কৃষ্ণাতিথির আকাশে অজস্র হীরক কণা।

একটা বড় বাগানের মাঝে একখানি বাড়ী। দেখে মনে হ'ল বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ী। চট্ করে মাথায় একটা প্ল্যান এল—ওখানেই থাকব আজ রাত্রে। খাওয়া না হয় নাই

হ'ল একদিন। ঘুমের নিতান্ত প্রয়োজন। বাগানের গেট বলে কোন একটা পদার্থ কোনদিন হয়তো ছিল, কিন্তু আজ নেই। কাজেই নির্ব্বিবাদে ঢুকে পড়লাম বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীটা নিতান্তই ছাড়া—দরজা জানালা সবগুলো যথাস্থানে নেই। পুরাণো ঝড়ঝড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। সামনেই একটা মস্তবড় হল ঘর। চারদিকে একটা নিবিড় নির্জ্জনতার আভাস। টর্চের আলোয় দেখলাম তক্তপোষ একখানি পাতাই আছে। ছোট্ট বেডিংটা খুলে ফেলে তক্তপোষটা ঝেড়ে নিয়ে বিছানা পেতে ফেললাম। পরক্ষণেই একেবারে গরম কম্বলের তলায়। চোখের পাতায় কে যেন ভারী সীসে ঢেলে দিয়েছে।

ঝুম, ঝুম, ঝুম···ভারী মধুর একটা বাজনার শব্দ—বাজনা মৃদু ও দ্রুততালে বেজে যাচ্ছে। স্বপ্ন গাঢ় হয়ে উঠেছে—কোন রূপসীর পায়ের অলঙ্কার শিঞ্জনে আমার নিদ্রিত ভুবন মুখরিত হয়ে উঠল। তালে তালে বাজছে নূপুর। সুন্দর চমৎকার রূপসী নর্ত্তকীর লাবণ্যময় দেহ আমারই চোখের সম্মুখে অপরূপ ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠেছে—রঙ্গীন ওড়না পেশোয়াজ লুটিয়ে পড়েছে—মূল্যবান্ অলঙ্কারে বাতির আলো ঝক্ ঝক্ করে উঠছে। কোন আরব্যোপন্যাসের উৎসব লীলামুখর রহস্যে আমি উপনীত হয়েছি। আমার সমস্ত সত্বা নিবিড়

হয়ে এল।···সহসা বাতিদানের বাতি নিভে গেল। চারিপাশ হতে অজস্র গোলাপজল ও আতর এসে পড়ল আমার গায়ে। জামা ভিজে ঠাণ্ডা লাগল শরীরে—জেগে উঠলাম। খোলা দরজা জানালা দিয়ে শীতের হাওয়া হু হু করে ঢুকছে। বিছানা ও গায়ের কম্বল বরফ হয়ে গেছে। তারই ঠাণ্ডা হাড়ের মধ্যে ঢুকে আমাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। কম্বলটাকে আরো নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে নিলাম। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রাত্রের সময় নিরূপণের চেষ্টা করলাম। প্রভাতি তারা জ্বল জ্বল করছে। চোখ বুজে আবার ঘুমবার চেষ্টা করলাম। স্বপ্নের মাধুর্য্য তখনও কাটেনি—সেই মিষ্টি বাজনা তখনও কানে আসছে—ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম! চোখ চাইলাম—স্বপ্ন তো নয়, সত্যিই কে যেন নূপুর পায়ে বাড়ীর চারপাশে দ্রুত পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কী যে মধুর শব্দ! কে এই রমণী? এত রাত্রে এই পরিত্যক্ত অট্টালিকায় কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বপ্নে দেখা রূপসীর সঙ্গে এর দেহসৌষ্ঠবের কতখানি সাদৃশ্য আছে। হয়তো কোন বিদেহী আত্মা পৃথিবীর বুকে আজও তার শিল্প-নৈপুণ্যের টানে বেড়াতে আসে। নির্জ্জন সহরপ্রান্তে পরিত্যক্ত এক গৃহে গভীর নিশীথের অন্ধকারে সে আসে! কান পেতে রইলাম। মুখর নূপুর বেজে চলেছে—শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—আনন্দ উৎসবের সাড়া

জেগেছে সেই ছন্দে। সেই সুর মাথায় ঢুকে এক অপূর্ব্ব মোহের সৃষ্টি করছে। ঘুম এলো না আর চোখে—শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম সেই নির্জ্জন নিশীথে রূপসীর নৃত্য বিলাসের অনুপম ঝঙ্কার। তারপর কোন সময়ে নূপুরের তাল হয়ে উঠল খুব দ্রুত ও স্পষ্ট—নৃত্য শেষের পূর্ব্বে রূপসীর লীলা কৌশল—আমার মস্তিষ্কের শিরায় তার স্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগল। তারপর হঠাৎ থেমে গেল নৃত্যঝঙ্কার একসময়ে। যেন কোন অবাঞ্ছিত লোকের উপস্থিতিতে রূপসী অপ্রসন্ন চিত্তে সরে গেল। তাল ভঙ্গে চোখ মেলে চাইলাম, ভোর হয়ে এসেছে।

দিনের প্রখর আলোয় রাত্রের রহস্যকে স্নায়বিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই মনে হল না। কিন্তু ঐ ভাঙ্গা বাড়ীর পরে একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। খোঁজ নিয়ে বাড়ীর মালীর সঙ্গে দেখা করলাম। ওই ভাঙ্গা বাড়ীটা ভাড়া নিতে চাই শুনে সে অবাক হয়ে চাইল, তারপর অনেক পরিশ্রমের পর সে আমার বক্তব্য বুঝল এবং রাজী হল। সারাদিন পরে সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরলাম। বাড়ীটা সত্যিই সহরের এক প্রান্তে, এদিকে লোকজন নেই বল্লেই হয়। বাগানে ঢুকেই বিস্মিত হয়ে গেলাম। পূর্ব্বরাত্রের সেই জঙ্গলাকীর্ণ বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঘাস আগাছা প্রায়

কিছুই নেই।—মালী সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ীটা বাসযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মনটা খুসী হল না, মনে হ'ল আগাছা গুলো থাকলেই ভাল হত'।

ঘুম ভেঙ্গে গেল…ঝুম ঝুম ঝুম নৃত্যের আসর সুরু হয়েছে, কিন্তু কাল রাত্রের সেই স্বাচ্ছন্দ্যবিলাস নেই আজকের মঞ্জীরে। মৃদু সন্তর্পিত শব্দ—যেন মুখর নূপুরকে কেউ শাসন করতে চায়। নিঃশব্দে আজ সে চলতে চায়—আমার অনধিকার প্রবেশে সে ক্ষুব্ধ বিরক্ত। পায়ের নূপুর আজ মুখর নয়, তবু রূপসী তাকে সম্পূর্ণ শাসন করতে পারেনি—আমি শুনতে লাগলাম সেই সুন্দর চরণযুগলের মধুর শব্দ। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছে আমারই গৃহের দিকে—যেন সে এই অনধিকারীকে একবার দেখতে চায়। আমি চোখ বুজে রইলাম যদি চোখ খোলার স্পর্দ্ধায় সে বিরক্ত হয়ে ফিরে যায়। ক্রমে কাছে—আরও কাছে এল সেই মধুর নূপুর নিক্কণ—আমি স্পষ্টই অনুভব করলাম রূপসীর যুগ্ম ভ্রূর বিরক্ত কুঞ্চিত আভাস—রক্তিম বঙ্কিম অধরোষ্ঠে সুকঠিন দৃঢ়তা—কৃষ্ণ আঁখিযুগলে ক্রোধের বিদ্যুৎ—অগ্নিশিখার মত তর্জ্জনী হেলিয়ে আমাকে চলে যাবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। আমি ত্রস্তে চোখ খুলে চাইলাম। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে সে সরে গেল। অবাধ্য নূপুর একবার দ্রুততালে বেজে নীরব হয়ে গেল।

বাইরে প্রভাতি তারার আলো।

পরদিন মালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা সে শুনেছে কিনা। সে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে বল্ল—সে কিছু শোনেনি। তা'ছাড়া বাড়ী ছাড়া হ'লেও উপদ্রব এখানে কিছু নেই। আমি চুপ করে চলে গেলাম। সে বাড়ীর মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কেমন একটা যাদুর মত। সারাদিন সহরে কাটিয়ে আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরলাম আমার সেই অজানা রহস্যভরা গৃহে। বাগানে ঢুকে দেখলাম আজ আর বাগানকে চিনবার উপায় নেই। মালি লোক লাগিয়ে সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করে ফেলেছে। এতটুকু আগাছা নেই। মালী তখনও সেখানে কাজ করছিল—আমাকে দেখে বল্ল—বাবু, আপনার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়—নানারকম পোকা-মাকড়ে বিশ্রী আওয়াজ করে তাই বাগান সাফ করে ফেলেছি। সেই শূন্য পরিষ্কার বাগানের দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত মন ব্যথিত হয়ে উঠল। অদৃশ্যচারিণীর প্রিয় বিলাস উদ্যানকে আমিই হতশ্রী করেছি। সেই অপরূপ অন্তরালবাসিনীকে আমি উৎপীড়িত করছি প্রতিদিন। গ্লানিতে আমার সমস্ত মন ভরে উঠল।

রাত্রে কান পেতে রইলাম সেই অদৃশ্যলোকবাসিনীর আগমন আশায়। বৃথাই—কোথাও আর তার সেই সুমধুর ঝঙ্কার

শোনা গেল না। প্রথমদিনের সেই অবিশ্রাম মঞ্জীর ঝঙ্কারে আর সেই পুরাতন গৃহের অলিন্দ কাঁপে না। কোথাও তার উপস্থিতির সাড়া নাই। প্রতীক্ষায় থেকে থেকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। উৎকণ্ঠিত কানে এলো অতি মৃদুস্বরে সে নূপুর ঝঙ্কার। অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে সেই নূপুর ঝঙ্কৃত হ'ল দূরে। বনবীথির অন্তরালে অদৃশ্যকারিণীর পদঝঙ্কার—কে যেন বড় বেদনায় বড় অভিমানে চলে গেল। আপনার নিভৃত উদ্যানের প্রতিটি তরুলতায় তার অকুণ্ঠ স্পর্শ জাগ্রত ছিল—সুদীর্ঘ তৃণে আচ্ছাদিত প্রান্তরে তার লীলায়িত নৃত্যের সাক্ষী ছিল—অজস্র নক্ষত্র। এই সহজ ও সুন্দর পরিবেশকে আহত করেছি আমি—আমারই জন্য সেই বিদেহী শিল্পী-আত্মা ব্যথিত হয়ে বিদায় নিল। মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম—'হে নেপথ্যচারিণী! অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় তোমার আনন্দে বিঘ্ন ঘটিয়েছি—তোমার এই নিশীথ রাত্রের বিলাসে আমার উপস্থিতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তোমার নিবিড় কৃষ্ণ আঁখির ভৎর্সনা-ভরা দৃষ্টি আমাকে তীব্র ভাবে আঘাত দিয়াছে—তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

দূরে মঞ্জীর নিঃশব্দ হয়ে গেল, অনুভব কর্ল্লাম সে আর কোন দিনই এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করবে না।

কলকাতায় ফিরে এসে এক বন্ধুর কাছে গল্প করেছিলাম।

বন্ধুটি জীবতত্ত্ববিদ্। হেসে আমাকে বলেছিলেন পশ্চিমের পাহাড়ী দেশে একরকম পোকা আছে, অনেকটা ঝিঁঝিঁ পোকার মত। রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয় তাদের ঐক্যতান সঙ্গীত। দূর থেকে শুনলে সুন্দরীর মঞ্জীর বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।

তা হোক,—তবু তাকে বিশ্বাস করতে মন চায় না, নেপথ্যচারিণীর মধুর মঞ্জীর আমার কানে আজও বাজে। সেই বাঞ্ছিত রাত্রি দু'টি আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

আবর্ত্তন

আকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িল। দীপ্ত আলোর একটি নীল রশ্মি মুহূর্ত্তের জন্য চোখকে ঝলসাইয়া দিয়া গেল। আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলাম, ক্ষণপূর্ব্বের তারকাটি যেখানে জ্বলিতেছিল—নিভিতেছিল, চোখ টিপি টিপি করিয়া পৃথিবীর পানে চাহিতেছিল—সে স্থানটি অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আশে পাশে অজস্র নক্ষত্র তেমনিই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে পৃথিবীর মানুষকে চোখের ইশারায় ডাকিতেছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই ওদের চোখের মায়ায় ধরা পড়িয়া যাইব। কিন্তু যে তারাটি খসিয়া পড়িল তাহার কি গতি হইল? কয়েক টুকরা ধাতব পদার্থের বাহিরে উহার আর কোনই অস্তিত্ব নাই? তবে উহাদের অত ঔজ্জ্বল্যের কি প্রয়োজন? শুনিয়াছি জ্ঞানীরা বলেন আমাদের এই পৃথিবীও অমনই একটি ধাতব পদার্থে গড়া উল্কাপিণ্ড, অমনই জ্বলিতেছে, নিভিতেছে, ঘুরিতেছে, ছুটিতেছে, হয়তো বা অমনই একদিন

কক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িবে। এমনই যুগযুগান্তর হইতে মানুষের জীবনও আবর্ত্তিত হইতেছে। জন্মিতেছে, মরিতেছে, উঠিতেছে পড়িতেছে। জন্ম জন্মান্তরে দেহ হইতে দেহান্তরে ঘুরিতেছে। বিচিত্র এই সৃষ্টি রহস্য। একই প্রাণ বহু হইয়া যুগে যুগে ফিরিয়া আসিতেছে। দেখিলাম নক্ষত্রমণ্ডলী আমার মুখের পানে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে। সকৌতুক হাস্যে আমার এই দার্শনিক চিন্তার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমাকে বলিতেছে— আইস, আমরা তোমাকে সকল তথ্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিব। জন্মরহস্যের বিস্ময় জানিবে।

সম্মুখে ছায়া পড়িল—চিন্তাচ্ছন্ন মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি একটি তরুণী। বুঝিতে পারিলাম না ব্যাপার কি। ছাদের পরে আমার নিকটে এই অপরিচিতা তরুণী কিসের প্রয়োজনে আসিয়াছে। চক্ষু ভাল করিয়া মুছিয়া চাহিলাম—দেখিলাম তরুণী হাসিতেছে। বিচিত্র উজ্জ্বল'বেশভূষা—সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া একটা অলৌকিক সৌন্দর্য্যের আলো খেলা করিতেছে। নিবিড় কৃষ্ণকেশরাশি, দীর্ঘায়ত চোখে হাসির জ্যোৎস্না! বিচিত্র লীলায়িত ভঙ্গীতে ছাদের আলিসার পরে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একখানি হাত আলিসার পরে, অপর হাতখানি আড়ভাবে বুকের পরে ন্যস্ত! আমার মুখে প্রশ্ন জোগাইতেছিল না। তরুণীর হাসিরও বিরাম নাই। অবিশ্রাম হাসিতেছে,

সহসা মনে হইল সুদূরের ঐ নক্ষত্রের হাসির সঙ্গে এর যেন কোথায় মিল রহিয়াছে। এমন সময়ে সুমিষ্ট কণ্ঠে তরুণী প্রশ্ন করিল—আমাকে চিনিয়াছ?

আমি হতবুদ্ধির মত কহিলাম—কই না তো।

হাসির তরঙ্গ তুলিয়া সে কহিল—এত সহজেই ভুলিয়াছ? আশ্চর্য্য তোমাদের স্মরণ শক্তি!

ব্যঙ্গে রাগ হইল, কহিলাম—স্মরণশক্তির দোষ দিওনা—তোমার সহিত এ জীবনে কোথাও সাক্ষাৎ হয় নাই। কেমন করিয়া চিনিব? তেমনই রহস্যভরা হাসিমুখে সে কহিল—এ জন্মে না হউক—অন্য জন্মে?

কহিলাম—জাতিস্মর নহি—বলিতে পারিব না।

সে কহিল—তাই তো কহিলাম আশ্চর্য্য তোমাদের স্মরণ শক্তি! আর এ জন্মে দেখা হয় নাই কহিলে তাহাও তো সত্য নহে। কত গভীর রাত্রে তোমার সহিত আমার চোখে চোখে কথা হইয়াছে—হাসির বিনিময় হইয়াছে। অপলক চোখে সকল ভুলিয়া দুইজন দুইজনের প্রেমে রাত্রি কাটাইয়াছি, এখনই তাহা ভুলিয়াছ? এখনই অপরের প্রেমে ডুবিয়াছ? সাধে কি আর কবি বলিয়াছেন তোমরা চঞ্চলচিত্ত অচিরস্থায়ী মধুলোভী মধুকর?

বিস্ময় সীমা ছাড়াইতেছিল—বলে কি! প্রতি রাত্রে ইহার

সহিত দৃষ্টির বিনিময় ঘটিয়াছে—উভয়ে উভয়ের প্রেমে কাটাইয়াছি। এ কোন বিকৃতমস্তিষ্কার পাল্লায় পড়িলাম ?

আমাকে নীরব দেখিয়া তরুণী হাসিল—বলিল আচ্ছা, আমার মুখের পানে ভাল করিয়া তাকাও তো,দেখ্ তো কোথাও এই দৃষ্টি, এই হাসি দেখিয়াছ কি না ? ভাল করিয়া স্মরণ কর—আপনাকে ফাঁকি দিও না।

সত্যই ভাল করিয়া চাহিলাম—সেই সুন্দর মুখের অতলস্পর্শী দৃষ্টি আমার অন্তর ভেদ করিয়া এক অতীন্দ্রিয় চেতনা জাগাইতেছিল ! কোথায় দেখিয়াছি এই মায়াময়—মোহময় দৃষ্টি ? কোথায় দেখিয়াছিলাম এই উন্মাদকরা হাসি ? আর অধিক ক্ষণ তরুণীর মুখের পানে চাহিতে সাহস হইতেছিল না। আর অধিকক্ষণ চাহিলে সমগ্র অন্তর ডুবিয়া যাইবে—দ্রবীভূত হইবে—আপনাকে সংযত রাখিতে পারিব না। আমার বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে তরুণী অপরূপ হাসি হাসিতে লাগিল।

মন কহিল—চিনিয়াছি।

স্মরণশক্তি হার মানিল—কহিল, না কখনও যাহাকে দেখি নাই, কেমন করিয়া চিনিব তাহাকে ?

মুহূর্ত্তে রমণীর মুখের হাসি বিলীন হইল ! অভিমান-রাগকণ্ঠে কহিল—মিথ্যাভাষী ! দেখ নাই ? মনে পড়ে না তাই বল। কিন্তু জন্মান্তরের বাঁধন কাটিবে কি করিয়া ?

আমি সঙ্কুচিত হইয়া কহিলাম—কাটিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। মন কহিতেছে তোমাকে জানি, স্মৃতি অপারগ—হার মানিতেছে। তুমি দয়া করিয়া রহস্য না ভাঙ্গিলে বিপদ কাটিবে না।

রমণীর মুখের মেঘ ঈষৎ কাটিল—তথাপি কহিল—যুগান্তর ধরিয়া পরিবর্ত্তনেও তোমাদের চিত্তের স্থিরতা আসিল না, পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায় সদাই টলটল করিতেছে।—আমিও হার মানিব না। আমাকে চিনাইয়া ছাড়িব।

তরুণী আমার কাছে সরিয়া আসিয়া আপন কোমল শীতল হস্তে আমার ব্যগ্র চোখ দুইটিকে স্পর্শ করিল। এক গভীর মায়ায় চোখের দৃষ্টি ঘন হইয়া বুজিয়া আসিল। চোখের সম্মুখে কেমন যেন একটা মায়াময় কুহেলীভরা আবরণ! দূরের আকাশের নক্ষত্র মিলাইয়া আসিল! ছাদের ওপাশের ফুল-গাছগুলি ঝাপসা হইয়া গেল। সকলি কেমন ধোঁয়াটে—অস্পষ্ট! তরুণীর হাসিমাখা মুখখানি আর দেখিতে পাইতেছি না। কেবলমাত্র অগ্নিশিখার মত তাহার তর্জ্জনী হেলাইয়া আমাকে কহিল—সম্মুখে দেখ। সবলে মনের জড়তাকে দূর করিয়া ভাল করিয়া চাহিলাম—

—এ কোথায় আসিয়াছি। চারিদিকে সুদীর্ঘ পাহাড়ে ঘেরা ছোট একটি উপত্যকা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে নিবিড় অরণ্য। বৃক্ষরাশি, লতাগুল্ম সকলই অপরিচিত মনে হইতে

লাগিল। পত্রপুষ্প সকলই বৃহৎ আকারের, সকলই অজানা। কেবলমাত্র প্রভাত জাগিতেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে—বৃক্ষরাশির শীর্ষে শীর্ষে! সহসা দেখিলাম পাহাড়ের একটি গুহা হইতে সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া একটি অতি অদ্ভুত দর্শনের জীব বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম—এক সুদীর্ঘ দেহ—প্রতি অঙ্গে অসীম বল ও শক্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে! রুক্ষ কেশ কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠে আসিয়া পড়িয়াছে। দেহ রোমশ—মুখে কোমলতার চিহ্ন মাত্র নাই—রূঢ় ও কর্কশভাব চোখে মুখে প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত পশুচর্ম্ম! হাতে একখানি তীক্ষ্ণধার টাঙ্গি! কে এই বিরাটদেহ প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ? রহস্যময়ীর মুখ দেখিতে পাইলাম না—কথা কর্ণে আসিল—চিনিলে না? তুমি।

আমি? বিস্মিত আমার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না! সে কহিল—হাঁ তুমি! সৃষ্টির আদিম প্রভাতেও তুমি আসিয়াছিলে—জীবনকে অনুভব করিয়াছিলে এই আজিকার মতই। সে চুপ করিল। আমি দেখিতে লাগিলাম—উপত্যকার মাঝে দাঁড়াইয়া সেই আদিম মানুষ! গুহার পানে চাহিয়া সে কাহাকে আহ্বান করিল—আহ্বানের উত্তর আসিল—গুহা হইতে বাহিরে আসিল এক রমণী—আদিম নারীমূর্ত্তি! সুন্দর সৌষ্ঠব-

পূর্ণ দেহ—দীর্ঘ বলিষ্ঠ। দীর্ঘ কেশভার জানু ছাড়াইয়া নামিয়াছে। শক্তির সঙ্গে মাধুর্য্য জাগিতেছে প্রতি অঙ্গে। বামকক্ষে একটি ক্ষুদ্র মানবক! ভবিষ্যত মানুষ! রমণীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—আজিকার এই রহস্যময়ীর সহিত কোথাও মিল আছে কি?

রহস্যময়ী কহিল—ভাবিতেছ কেন? আমিই ওই রমণী—তোমার আদিম সহচরী ছিলাম। তোমার সকল সুখ দুঃখের অংশ সেদিন সমান ভাবে বাঁটিয়া লইয়াছিলাম।

কহিলাম—হাঁ মনে পড়িতেছে। সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাতে তোমাকে আপনার করিয়া পাইয়াছিলাম—কিন্তু হারাইলাম কেন? সে কহিল—দেখিয়া যাও—

পার্ব্বত্য পুরুষটি কহিল—তুমি সাবধানে থাকিও—হিংস্র-পশুর উপদ্রব বাড়িয়াছে।

আপন কোমর বন্ধের শাণিত ছুরিকা দেখাইয়া রমণী কহিল আমার জন্য ভাবনা করিও না—আমি প্রস্তুত আছি। পুরুষটি চলিয়া গেল—রমণী তাহার শিশুকে লইয়া আলস্য কৌতুকে সময় কাটাইতেছে—বেলা বাড়িতে লাগিল। পাহাড়ের বুক বাহিয়া দুরন্ত ঝরণা লাফাইয়া লাফাইয়া নামিতেছে। রমণী উঠিয়া শিশুকে স্নান করাইল—আপনিও স্নান করিল। স্নানের পর পরিধেয় পরিচ্ছদ একটু শোভন করিবার চেষ্টা—পরিধেয়

আর কিছুই নয়—সেই পশুচর্ম্মের আবরণ কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত। বুকে আর একখানি কাঁচুলীর মত করিয়া বাঁধা। হাত দিয়া চুলগুলি প্রসাধিত করিল। আদিম নারীর মাঝেও দেখিলাম নারীর চিরন্তনী প্রসাধনস্পৃহা!

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—পার্ব্বত্য পুরুষ শিকার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তাহার স্কন্ধের পরে বিলম্বিত এক মৃত শম্বরের রক্তাক্ত দেহ। রক্তে তার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়াছে,—মুখে জয়ের উল্লাস! রমণী আসিয়া অবলীলাক্রমে তাহার পিঠ হইতে নামাইয়া লইল সেই পশুর দেহ। ঝরণার জলে বস্ত্রসিক্ত করিয়া স্নেহে ও যত্নে তাহার দেহ পরিষ্কার করিয়া দিল। প্রসন্নমুখে পুরুষটি বসিল বিশ্রাম করিতে। নারী অগ্নি জ্বালিল। শুকনা খড় কুটো পাতা ডাল যোগাড় করিয়া চকমকির সাহায্যে অগ্নি জ্বালানো দেখিলাম, তারপর দেখিলাম সেই মৃত শম্বরের চর্ম্ম ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড মাংস অগ্নিদগ্ধ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার সেই আদিমতম উপায়। খাইতে খাইতে কত গল্প—কত শিকার কাহিনী। অবশেষে খাওয়া শেষ করিয়া পুরুষ কহিল—এবার যাত্রা করিতে হইবে।

নারীর কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন জাগিল—কেন? বেশ তো ছিলাম এইখানে আবার কোথায় যাইব।

দলের সকলেই বাস উঠাইয়া নূতন স্থানের সন্ধানে চলিয়াছে

—এখানে শিকারের অভাব ঘটিতেছে, বাহির হইতেই হইবে।

আদিম নারীর চোখে ব্যাকুলতা—নিশ্চিত আশ্রয় ছাড়িয়া অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াইতে নারীর মনে জাগে চিরদিনই শঙ্কা উদ্বেগ! পুরুষ আপন তীরধনুক ও টাঙ্গি লইয়া হাঁকিল—চল আর দেরী নয়। সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগন হইতে 'নামিয়াছে। নারী কহিল—দু'দণ্ড অপেক্ষা কর। একটু গুছাইয়া লই। আদিম নারী আপনার চর্ম্মঝুলিটি বাহির করিল। উদ্বৃত্ত মাংসগুলি তাহার মধ্যে রাখিল। চকমকি পাথর, ছুরি, পাতার গ্রথিত পাত্র—অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইল। অসহিষ্ণু পুরুষ পুনঃ পুনঃ তাগাদা দিতেছে—কিন্তু নারীর শাশ্বত গৃহমুখী প্রাণ পরিচিত আবাস ছাড়িয়া যাইতে কেবলই দ্বিধা বোধ করিতেছে—পিছু চাহিতেছে। অবশেষে সন্তানকে বক্ষে ও চর্ম্মঝুলি পিঠে বাঁধিয়া নারী পুরুষের অনুগমন করিল। সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছে—ধূসর প্রান্তর—সবুজ বনানীর আড়ালে আড়ালে চলিয়াছে যাত্রী নরনারীর এক বৃহৎ দল। তাহাদের পুরুষের হাতে সুদীর্ঘ বল্লম—পিঠে তীর ধনুক প্রখর সূর্য্যের তাপে তামাটে বর্ণ তাহাদের। পশ্চাতে নারীর দল—বক্ষে সন্তান, কিংবা কাহারও সন্তান হাঁটিয়া চলিয়াছে! প্রত্যেকের পিঠে সঞ্চয়ের থলি। যাযাবর পুরুষের পিছনে

যাযাবরী নারীর দীর্ঘযাত্রা। গৃহ খুঁজিয়া মরিতেছে দিনের পর দিন। সারাজীবন তাহাদের কেবলই মরীচিকার পানে ছোটা। কোথাও ক'দিনের জন্য গৃহ বাঁধা, আবার মুহূর্ত্তের তাগিদে তখনই পথে বাহির হওয়া, যাত্রীর দল সুদূর প্রান্তরের সীমায় ক্ষুদ্র হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

রহস্যময়ীকে ডাকিয়া কহিলাম—এখনও আছ কি ?

উত্তর আসিল—আছি। জন্মান্তর হইতে তোমারই সঙ্গে ঘুরিতেছি—গৃহ বাঁধিতেছি—ভাঙ্গিতেছি। যাইব কোথায় ? চাহিয়া দেখ—

দেখিলাম—পৃথিবীর রূপ বদলাইয়াছে। ঊষর প্রান্তরের বুকে ঘর উঠিয়াছে। চারিদিকে শ্যামলিমার ছায়া! বিশাল প্রান্তরের বুকে সোনার শস্য বাতাসে হেলিতেছে, দুলিতেছে, মাথা নোয়াইয়া এ উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে। দেখিলাম—সুন্দর গৃহ প্রাঙ্গণ, দেখিলাম—গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী, ছাগল, ভেড়া। দেখিলাম সুস্থ বলিষ্ঠ চাষের বলদ ও মহিষ! দেখিয়া চোখ জুড়াইল। এত প্রাচুর্য্য বড় ভাল লাগিল আমার এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত চোখে। রহস্যময়ী কহিল—ও কি চোখ বুজিতেছ কেন ? চাহিয়া দেখ।

চাহিলাম—সুন্দর বলিষ্ঠদেহী পুরুষ গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চাষের বলদ লইয়া মাঠে যাত্রার আয়োজন করিতেছে। দ্বারপথে

কৃষক রমণী! সেই যাযাবরীর লীলায়িত দেহ মাধুর্য্য! কেবল উগ্রতা আর নাই, শুধুই কোমলতা, সেই সদা সন্ত্রস্ত উৎসুক আঁখির দৃষ্টিতে পরম নির্ভরতা ও মমতা ঝরিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম পুরুষের দেহে পরিবর্ত্তন আসে নাই, শুধু তাহার রুক্ষতা কমিয়াছে—তাহারও চোখে মুখে দেখিতেছি প্রসন্নতার আভাস। স্নেহ মমতার উৎস যেন বুকের মাঝে জাগিতেছে। রমণীর পানে চাহিয়া কহিল—মাঠে চলিলাম! ফিরিব সন্ধ্যায়, রমণী কোমলস্বরে কহিল—সতর্ক থাকিও, শুনিতেছি লুণ্ঠনকারী যাযাবর জাতি নিকটে আসিয়াছে।

আপন সবল শক্ত দেহখানির পানে তাকাইয়া পুরুষ হাসিল—কহিল—আমার জন্য ভাবিনা, তোমরা সাবধানে দিন অতিবাহিত করিও, বিপদে হতবুদ্ধি হইও না।

আপন সুন্দর দেহখানি ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া রমণী গর্ব্বিতকণ্ঠে কহিল—ভুলিয়া যাইও না কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের পিতামহীরা যাযাবরী ছিলেন—যাঁহাদের দেখিয়া হিংস্র পশু ভয়ে পলায়ন করিত। ঘর বাঁধিয়াছি বলিয়াই শক্তি হারাই নাই। বলিষ্ঠ নধরকান্তি শিশু আসিয়া পিতার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার মুখে সস্নেহ চুম্বন আঁকিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চাষের বলদ লইয়া পুরুষ মাঠের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার যাত্রাপথের পানে চাহিয়া চিত্রপ্রতিমার মত নারী দুয়ারের কপাট ধরিয়া

দাঁড়াইয়া আছে। পুত্র আসিয়া মায়ের অঞ্চল আকর্ষণ করিল। মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ দেখিলাম রমণীর সর্ব্বাঙ্গে। নত হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।......ধীরে ধীরে সকল ঝাপসা হইয়া আসিল।

রহস্যময়ী কহিল ঘুমাইতেছ নাকি?

কহিলাম—না, দেখিতেছি!

সে কহিল—কি দেখিলে? উহারা কে?

কহিলাম—পরিচিত বটে—তবে চিনিতেছি না।

রমণী কহিল—তুমি ও আমি। যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়াছে! তোমাকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছি। খাদ্যের সন্ধানে আর অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিতে হয় না—মাঠে মাঠে সোনা ফলিতেছে। চঞ্চল পুরুষ তাই ক্ষণিক থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। নারী ভাবিতেছে বুঝি বা তাহার পতিপুত্র লইয়া ঘর বাঁধা সার্থক হইল। কিন্তু তোমাদের বাঁধিবে কে? নিশ্চয়তার মাঝে তোমরা থাকিতে ভালবাস না। তাই আবার একদিন ঘরের বাঁধন কাটিলে…।

আমি কহিলাম—বৃথা দোষ দিতেছ কেন? আমরা ঘরের মায়া কাটিতে চাহি না—তোমরাই চিরদিন পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিয়া কেবল বাহিরে যাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ—আমরা নিরুপায় হইয়া বাহিরে যাত্রা করিয়াছি।

আবর্ত্তন

রমণী কহিল—কথা থামাও—চোখ চাহিয়া দেখ—

—দেখিলাম—সম্মুখে বিপুল সিন্ধু গর্জ্জাইতেছে, কোথাও কূল নাই—উপরে নীচে কেবল সীমাহীন নীল—সিন্ধুতীরে বাঁধা রহিয়াছে একখানি ময়ূরপঙ্খী জলযান, জলযানের সম্মুখে মঙ্গল সিন্দুরচর্চ্চিত শুভ্র পতাকা বাতাসে আপন বিজয় ঘোষণা করিতেছে। সিন্ধুতীরে কেবলমাত্র দুইটি নরনারী। পুরুষের দেহে নাবিকের পোষাক। নারীর দেহে দেখিলাম ঘাঘরা ও ওড়না আসিয়াছে। দুজনেরই মুখ বিষণ্ণ, ম্লান। তথাপি তাহারই মধ্যে দেখিতেছি পুরুষের চোখে জ্বলিতেছে সুদূরের স্বপ্ন! অসীমের নেশা তাহাকে হাতছানি দিতেছে—ক্ষণে ক্ষণে সঙ্গিনীকে সে ভুলিয়া যাইতেছে, গৃহের মায়া তাহাকে টানিতেছে না। নারীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া এক লম্ফে সে জলযানে উঠিল। কহিল—চলিলাম—তোমার দেহের উপযুক্ত বেশভূষা সংগ্রহ করিয়া ফিরিব। তোমার কৃষ্ণকেশে অমূল্য মাণিক্য দিয়া সাজাইব। তোমার কণ্ঠ মুক্তামাল্যে সুশোভন করিব। বাহুপাশে প্রবালের বালা দিব। চরণে মঞ্জীর বাজিবে। দেহে উঠিবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের টানাপোড়েনে সৃষ্টি করা অপরূপ মেখলা ও কাঁচুলী। প্রতীক্ষায় থাক—আমি আসিতেছি।

রমণী কাঁদিয়া কহিল—তুমি ফিরিয়া আইস, ও ছাই ভূষণ

ও বসন আমি চাহি না। নিরুদ্দেশের পথে তোমাকে পাঠাইয়া আমি কাহাকে লইয়া গৃহে থাকিব ?

ময়ূরপঙ্খীর পালে হাওয়া লাগিয়াছে। সিন্ধু তরঙ্গে দুলিতেছে সুন্দর সুসজ্জিত তরী—দৃঢ় হস্তে হাল ধরিতে ধরিতে পুরুষ কহিল—পুত্রকে দেখিও। তাহাকে বড় করিও, আমি সত্বরই আসিব। দেখিবে ঐশ্বর্য্যে কত সুখ ! অনুকূল হাওয়ায় তরণী ছুটিল দুরন্ত বেগে। পুরুষের চোখে সুদূরের ইশারা—বিপুলতার আভাস। বিরাট বিশ্বে আপনাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার এক গভীর উল্লাস তাহার আঁখিতে—ওষ্ঠে—সমস্ত দেহে। উপরে সিন্ধুশকুনের দল চলিয়াছে পাল্লা দিয়া। তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে তীরে প্রতীক্ষমানা নারীর পানে চাহিতে পুরুষ ভুলিয়া গেল।

উপেক্ষিতা নারী বেদনাব্যাকুল অভিমানাশ্রুকে অমঙ্গল আশঙ্কায় সবলে রোধ করিল। ক্রমে তরী মিশিয়া গেল সুদূর দিক সীমানায়।

দেখিলাম প্রতি সন্ধ্যায় প্রবাসী প্রিয়ের মঙ্গল কামনায় নারী একখানি মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া সিন্ধুতরঙ্গে ভাসাইয়া দিতেছে—সিন্ধুদেবতার কাছে সকাতরে নিবেদন করিতেছে স্বামীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য।

নারীর ব্যাকুলতায় বুকে বেদনা বোধ করিলাম। রহস্যময়ী

তাহা বুঝিল—কহিল, বেদনা পাইতেছ? কিন্তু কই, সেইদিন সিন্ধুতীরে একাকী অসহায়ভাবে ফেলিয়া যাইবার সময়ে তো একটিবারও ফিরিয়া তাকাইতে ভুলিয়াছিলে!

কহিলাম—উপায় ছিল না দেখিতেছ—তোমারই দেহকে ভূষিত করিবার জন্য, তোমারই ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্য দুস্তর সিন্ধুর মাঝে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতে দ্বিধা করি নাই। অথচ তোমরাই যদি তাহাতে দুঃখিত হও, তাহাতে আমাদের কি-ই বা আছে বলিবার?

রমণী কহিল—এমনই ভুল বুঝাইয়াছ চিরদিন আমাদের—অথচ তোমরা বেশ জান নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছ তোমাদেরই আনন্দের জন্য। ছোট গৃহের ছোট গণ্ডিতে তোমরা বাঁধা থাকিতে চাহ নাই—আমাদের মায়ার বাঁধনকে বারংবার তুচ্ছ করিয়া বিশ্বের আহ্বানে সাড়া দিয়াছ—রহস্যময়ী অজ্ঞাত প্রকৃতি সারাক্ষণই আপন সৌন্দর্য্য, আপন রহস্য লইয়া কেবলই তোমাদের আহ্বান জানাইতে-ছেন—অথচ আপনাকে লুকাইয়া ফিরিতেছেন - তোমরা তাঁহাকেই আপন বরমাল্য দিয়াছ—সেই পলাতকা বধূর সন্ধানে সারাজীবন ছুটিতেছ। আমরা বৃথাই কাঁদিয়া মরি।

কহিলাম—এ তোমাদের অন্যায় অভিযোগ। অভাগা

পুরুষ জাতিকে দোষারোপ করিতে ভালবাস বলিয়াই এই অহেতুকী রোদন।

সে কহিল—ও সব কথায় ভুলিবার দিন গিয়াছে। আর ভুলিব না। চাহিয়া দেখ—

দেখিলাম—সুন্দর সুসজ্জিত আকাশচুম্বী প্রাসাদ অট্টালিকা। রাজপথে পথে পুষ্প আস্তীর্ণ। বিপণিমালা আলোকে সজ্জিত। আনন্দমুখর নরনারী উৎসবে মাতিয়াছে। রঙীন বেশভূষা। পলাশ ও অশোকে বসন্তোৎসব সুরু হইয়াছে। প্রমোদমুগ্ধ মহানগরী। সহসা রাজপ্রাসাদের প্রাকারশীর্ষ হইতে শুনিলাম বাজিয়া উঠিল বিপদের সঙ্কেত ধ্বনি! দেশের উৎসবের সুযোগে শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। মুহূর্ত্তেই রাজপথের চেহারা বদলাইয়া গেল। উৎসবমুখর নরনারী গৃহে ফিরিল। পরক্ষণেই দেখিলাম সৈনিকের বেশে সজ্জিত দেশের তরুণদল তালে তালে পা ফেলিয়া যাত্রা করিয়াছে প্রশস্ত রাজপথ জুড়িয়া।

একটি গৃহের সম্মুখে দেখিলাম সৈনিক বেশে সজ্জিত তরুণ আর তাহার নবপরিণীতা পত্নী! পত্নীর দেহের বসন্তসজ্জা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে—পুষ্পমাল্য ছিন্ন হইয়া ফুলগুলি মাটিতে লুটাইতেছে—সৈনিক কহিল—চলিলাম, আর দেখা হইবে কি না জানি না!

তরুণীর নীল আঁখিযুগল রোদনাক্ত, কহিল,—তাহাই হউক।

শুভযাত্রায় চোখের জল ফেলিব না। তোমরা তো চিরদিনই যাত্রা করিয়া আসিয়াছ—আমরা বিদায় আলিম্পন আঁকিয়াছি আপন বুকের শোণিতে। আমারও দেহে পিতামহীর শক্তি ও সাহস সঞ্চিত আছে—দুঃখ করিব না। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আইস—জয়োৎসবের ভাগিনী হইব। যদি বীরের মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করে আমিও তোমার অনুগামিনী হইব।

দূরে যুদ্ধের দামামা বাজিতেছে। অস্থির অশ্বক্ষুরের শব্দ শোনা যাইতেছে প্রাঙ্গণে! বিদায় লইয়া সৈনিক দ্রুতপদে যাত্রা করিল। তরুণীর আঁখি হইতে সযত্নরুদ্ধ জল এতক্ষণে ঝরিল।

রহস্যময়ী কহিল—দেখিলে তোমার যুদ্ধযাত্রা?

কহিলাম—দেখিয়াছি, তুমি কি সহমৃতা হইয়াছিলে?

কহিল—তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি? আমার কর্ত্তব্য আমার কাছে—তোমাকে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

কহিলাম—তাই বটে, দেখা শেষ হইল?

সে কহিল—কেন? বিরক্ত হইতেছ? কিন্তু উপায় নাই শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেই হইবে। ওই দেখ—

সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ—নবীন যুবক সুন্দর বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া ঘুরিতেছে। কণ্ঠে পুষ্পমাল্য—সর্ব্বাঙ্গে সুবাসিত গন্ধদ্রব্য। অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত দেহ। চারিদিকে মঙ্গল দ্রব্যাদি ছড়ানো। শুনিলাম যুবকের শুভপরিণয় উৎসব। নগরীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী

উৎপলপর্ণা ভাবী বধূ। থাকিয়া থাকিয়া বধূর সুন্দর মুখখানি তাহার মানসপটে জাগিতেছে। সহসা রাজপথে কিসের কোলাহল? অলিন্দ হইতে যুবক ঝুঁকিয়া পড়িয়া উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। নিম্নে জনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই মাঝে কে ঐ অপরূপ সৌম্যকান্তি দেবতা? গৈরিকে আবৃত তনু, হস্তে ভিক্ষাপাত্র—নয়নের কোণে শান্তির স্বপ্ন জাগিতেছে—অধরে অনুচ্চারিত নির্ব্বাণ মন্ত্র! যুবকের অলিন্দের নীচে আসিয়া দেবতা ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া কহিলেন—ভদ্র, ভিক্ষা দাও!

মুহূর্ত্তে যুবকের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইয়া গেল। কি ভিক্ষা সে দিবে ওই রাজতিলকলাঞ্ছিতললাটধারী ভিখারীকে? কি দান শোভন হইবে ওই প্রসারিত পদ্মকরে? একটি মুহূর্ত্ত! প্রসন্ন নয়ন তুলিয়া ভিক্ষু কহিলেন—ভিক্ষা দাও ভদ্র!

দ্রুতপদে যুবক নামিয়া আসিল। ভিক্ষুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আপন ভিক্ষাপাত্র তাহার পানে প্রসারিত করিয়া দিলেন। কম্পিতহস্তে যুবক সেই ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিল। ভিক্ষু ইঙ্গিত করিলেন—শোভাযাত্রা আবার চলিতে সুরু করিল। যুবক চলিতেছে তথাগতের পাশে পাশে। হাতে তাহার ভিক্ষাপাত্র—নয়নে অশ্রুর আভাস। সম্মোহিতের মত ধীরে ধীরে সে চলিতেছে। শোভাযাত্রা চলিতে চলিতে অবশেষে

এক সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণে আসিল। ততক্ষণে কোলাহল উঠিয়াছে উৎপলপর্ণার বাগদত্ত স্বামী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে! সেই সংবাদ আসিল গৃহে।

উৎপলপর্ণা আসিয়া দাঁড়াইল অলিন্দে—আপন সুন্দর নয়ন দুটি ভরিয়া দেখিল প্রিয়ের সংসার ত্যাগ। আঁখিজলে প্লাবিত হইয়া গেল তাহার নয়ন। যুবক তাহার আঁখিতে আঁখি মিলাইতে ভয় পাইল। হয় তো আবার ক্ষুদ্র মায়ায় গৃহের পানে আকর্ষণ জাগিবে। তাহার নয়নে জাগিতেছে নির্ব্বাণের আনন্দ—মুক্তির স্বপ্ন! ভিক্ষুর শোভাযাত্রা নগরপ্রান্তে মিলাইয়া গেল।

উৎপলার নয়নের অশ্রু শুষ্ক হইল। যুবকের গমনপথের পানে চাহিয়া কহিল—ভাবিয়াছ আমি তোমার উপসম্পদা গ্রহণে বাধা দিব, তোমার নির্ব্বাণের পথে অন্তরায় সৃজন করিব। ভুল বুঝিয়াছ তুমি, নারীর অন্তর কোমল কিন্তু দুর্ব্বল নহে। তোমার মুক্তির পথ প্রশস্ত হউক,—আনন্দময় হউক, মঙ্গলময় হউক। আমাকে ত্যাগ করিবে কেমন করিয়া। তোমার সহিত আমার একসূত্রে পথচলা। যুগান্ত ধরিয়া একই পথে চিরকাল পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছি। আজিও তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিব না।

পরদিন প্রাতে দেখিলাম মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিকধারিণী উৎপলা ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া চলিয়াছে নগরের পথে ভিক্ষুদলের

সহিত তাহার বাগদত্ত স্বামীর পাশে পাশে। চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম—নির্ব্বাণের মধুময় সঙ্গীত গাহিয়া ভিক্ষু ভিক্ষুণীর দল চলিয়া গেল। আমার পিপাসিত চোখের সম্মুখে শান্তির স্বপ্ন মিলাইয়া আসিল। কহিলাম—রহস্যময়ী আছ কি?

সে কহিল—আছি বই কি! কেমন দেখিলে?

কহিলাম—সুন্দর।

সে কহিল—শুধুই সুন্দর? বেদনাময় নহে? যুগে যুগে নারীর সুখের ঘর এইভাবে তোমরা ভাঙ্গিয়াছ। যাযাবরীর গুহা হইতে গুহা পরিত্যাগ আর শ্রেষ্ঠীকন্যা উৎপলপর্ণার প্রব্রজ্যা গ্রহণ একই ত্যাগকাহিনী। কেবলমাত্র দুঃখ বেদনার তারটি সূক্ষ্ম হইয়াছে—অনুভূতি কোমলতর হইয়াছে। নইলে প্রভেদ আর কোথায়? তথাপি আমাদের সংসার গড়িতে হয়—তোমাদের সুখে দুঃখে আমরা আত্মবলিদান দেই। ব্যগ্র অন্তরে তোমাদের আবদ্ধ রাখিতে চাই—ফলে আমরাই মাথা খুঁড়িয়া মরি। আর কিছুই লাভ করিতে পারি না। যুগান্তরের মমতা লইয়া আমরা কেবলই দুঃখ পাইতেছি। তোমরা কোনওদিনই আমাদের পানে ফিরিয়া চাহ না।

আমি কহিলাম ইহাতে দুঃখ পাইও না। তোমাদের সৃষ্টি—আমাদের ধ্বংস, তোমাদের ঘর—আমাদের প্রান্তর, তোমাদের মায়া—আমাদের শক্তি এই লইয়াই পৃথিবী অগ্রসর

হইয়াছে সভ্যতার পথে ! যুগে যুগে, স্তরে স্তরে, তোমার ও আমার সম্মিলিত কার্য্যের ফলেই হইয়াছে অগ্রগতি সমগ্র মানবজীবনের। যাযাবরী ধরণী আজ ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী সুন্দরী ইহা তোমার ও আমার সম্মিলিত গৃহধর্ম্ম ও ত্যাগধর্ম্মের ফলে সৃজন হইয়াছে। তাই আজ সভ্যতার এত নব নব শোভনরূপ—

বাধা দিয়া সে কহিল মিথ্যা কথা। শোভনরূপ কোথায় ? ধ্বংসের ফলে পৃথিবীর রূপ কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার আমার জন্মান্তরের সৃজন মাধুর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে—কলুষিত হইয়াছে। আবার পৃথিবীর বুকে নবসৃষ্টি প্রয়োজন। পৃথিবীর ধ্বংসরূপে ভীত হইয়া নরনারী আবার খুঁজিতেছে গুহাগহ্বরে আপন আশ্রয়স্থল। সুদূর নক্ষত্রলোক হইতে দেখিলাম বিষজীর্ণ ধরণীর এই কলঙ্কময় রূপ—তাই স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি—তোমাকে আহ্বান জানাইতে আসিয়াছি। আমাদের নূতন পৃথিবী সৃষ্টির সময় আসিয়াছে। নূতন যুগের প্রভাতে নব শক্তিসম্পন্ন নরনারী প্রয়োজন। শীর্ণা তপঃক্লিষ্টা ধরণীর আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হইতেছে প্রতিনিয়ত। সে প্রার্থনায় কাঁপিতেছে আকাশ-বাতাস। ভুবন মুখরিত হইয়া উঠিল সে আহ্বানে। তাহারই টানে আমি আসিয়াছি।

কহিলাম—এতক্ষণে তোমাকে চিনিয়াছি।

সে কহিল—কে বল তো ?

কহিলাম—ঐ স্খলিত নক্ষত্র—যে নক্ষত্র এইক্ষণেই আকাশ উজ্জ্বল করিয়া খসিয়া পড়িল আমারই চোখের সম্মুখে। এতক্ষণে চিনিয়াছি তোমার ঐ হাসি—ঐ দৃষ্টি। প্রতি রাত্রে আমাকে তুমি ওই সুদূর নক্ষত্রলোক হইতে আহ্বান জানাইয়াছ। সত্য কথা তোমাকে ভোলা আমার উচিত হয় নাই। জন্ম জন্মান্তর হইতে তোমারই মমতাভরা দৃষ্টি আমাকে পথনির্দ্দেশ দিতেছে।

সে কহিল—তবে আইস।

কহিলাম—কোথায় ?

উত্তর আসিল—নবসৃষ্টিমানসে—নূতন পৃথিবীর বুকে নবজন্ম গ্রহণ করিতে আইস। ক্রমে তার কণ্ঠ মিলাইয়া আসিল। তাহাকে ডাকিলাম—আবার ডাকিলাম। রহস্যময়ী বিদায় নিয়াছে।

ভাল করিয়া চাহিলাম—রাত্রি অনেক হইয়াছে। রেডিওর সংবাদঘোষক কহিতেছেন—"সাইরেণ বাজিলেই আপনারা ভুগর্ভস্থ মাটির কক্ষে আশ্রয় লইবেন"—মনে মনে কহিলাম—রহস্যময়ী ! নব সৃষ্টির সন্ধিক্ষণ সত্যই আসিয়াছে। কিন্তু সে যুগস্রষ্টা মানব কোথায় কত দূরে ?

স্খলিত নক্ষত্রের শূন্য স্থানটী চোখে জাগিতে লাগিল।

তুমি কি কেবল ছবি

চিত্রখানি টেবিলের পরেই পড়িয়া রহিয়াছে। সুন্দর একখানি চিত্র। একটি নতমুখী তরুণী—সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সারা অঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু মুখের ভাব বড় বিষণ্ণ—নত আঁখিতে শঙ্কিত দৃষ্টি। তবু তাহারই মধ্যে ওষ্ঠে একটু হাসির রেখা—অতি সূক্ষ্ম সে রেখাটি—তথাপি তাহাতেই তাহার সমস্ত মুখে একটি অপ্রকাশিত বাণী ধরা পড়িয়াছে। যে পড়িতে জানে তাহার নিকট তাহার অর্থ গোপন থাকিবে না। চিত্রখানির পাশে একখানি অতি সাধারণ ফোটোগ্রাফ্—সেও একটি তরুণীর। অতি সাধারণ একটি মেয়ে। বুদ্ধিমত্তার কোনও আভাস নাই—মুখের কিছুই সুন্দর নয়। চিত্রখানির পাশে ফোটোখানি বড় নিস্প্রভ বলিয়া মনে হয়। ফোটোর তরুণীটির মুখেও ঈষৎ হাসির রেখা, হাসি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ভরা।

সংসারের পানে চাহিয়া যে কেবল নিরাশারই ছবি দেখিয়াছে সে যদি হাসিয়া উঠে তার হাসিটি বুঝি এমনই দেখায়।

টেবিলের ওপাশে বসিয়া আছেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জীবনযুদ্ধে পরাজিত চেহারা তাঁর। টেবিলের এ পাশে বসিয়া আছি আমি।

ভদ্রলোকটি বলিতেছেন—এ ছবি তো আমি চাহি নাই—আমার কন্যার এই ফোটো হইতে আপনি আঁকিয়াছেন ঐ ছবি? এ দুই কী এক?

আমি কহিলাম—না, তাহা হয় নাই। কিন্তু এও আপনার কন্যারই ছবি—আপনি কেন চিনিতেছেন না।

ভদ্রলোক ভাবিলেন আমি রহস্য করিতেছি। কহিলেন—আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক বড়। তাহার উপর কন্যাহীনা—শোকার্ত্ত! এ সময় রহস্য করা কি শোভন? বিব্রত হইয়া পড়িলাম—কহিলাম—ক্ষমা করিবেন! রহস্য একেবারেই করি নাই। আপনার কন্যার যে রূপ আমার চোখে পড়িয়াছে আমি তাহাই আঁকিয়াছি। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখুন আপনার কন্যার ঐ মুখের হাসিটিও কী চিনিতেছেন না?

বৃদ্ধ ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিত্রের পানে চাহিলেন—কহিলেন—হাসিটা আমার কন্যারই বটে। হাসিলে আমার মাকেও অমনই দেখাইত। কিন্তু তাহা হইলেও এ চিত্র তাহার নহে—সে তো

সুন্দরী ছিল না, সুন্দরী হইলে······বলিতে বলিতে ভদ্রলোকের চোখে জল আসিয়া পড়িল। সামলাইয়া লইয়া কহিলেন—না, আমি চলিলাম—ফোটোখানি দিন—আমি অন্য আর্টিস্টকে দিয়া করাইব।

ফোটোখানি ফেরৎ দিয়া কহিলাম—আপনার অ্যাডভান্সের টাকাটা—

ভদ্রলোক উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—না, আমার মায়ের হাসিটি মিলিয়াছে—টাকা ফেরৎ লইব না। ভদ্রলোককে অন্য কেহ হয়তো উন্মাদ ভাবিত—আমি ভাবিলাম না। চিত্রের অসঙ্গতির জন্য হয়তো অনেকের প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে—কাহিনীটি তাই খুলিয়াই বলি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভদ্রলোক আমাকে তাঁহার কন্যার ফোটোখানি দিয়া গিয়াছিলেন। কন্যাটি তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিল। মারা গিয়াছে অতর্কিতে, মাত্র এইটুকুই শুনিয়াছিলাম। মেয়েটির আর কোনও ফোটো ছিল না; সাধারণ বাঙ্গালী ঘরে যাহা ঘটিয়া থাকে। কবে কন্যার ক'নে দেখানো সাজে তোলা হইয়াছিল এই ছবিখানি—তাহার মৃত্যুর পরে ভদ্রলোকের একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেইটি। সাধারণ একটি মেয়ে—কোনও গভীর বুদ্ধিমত্তার ছাপ নাই তাহার মুখে—চোখ দুটি অপরূপ নয়, মুখের ভাবে নাই অনির্ব্বচনীয়তা। নেহাৎই সাধারণ

একটি মেয়ে। স্বল্প কয়েকদিনের আয়ু লইয়া সংসারে আসিয়াছিল। অবজ্ঞাত অখ্যাত থাকিয়াই সে ফিরিয়া গিয়াছে পরলোকের পথে। ফোটোখানি হাতে লইয়া মনটা বিশেষ প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। মনে মনে ভাবিলাম সুন্দর মুখ হইলে আঁকিবার পরিশ্রমটা সার্থক হইত। নিতান্তই অসুন্দর মুখখানি। এতটুকু সৌন্দর্য্যবোধ আছে যাহার সে দেখিয়া খুসী হইবে না—বিশেষ করিয়া আমার মত আর্টিস্ট। তবুও কাজ করিয়া যখন টাকা লইয়া থাকি এবং সেই টাকায় আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তখন কাজ লইতে আপত্তি করা চলে না। কাজটা নিতান্তই আবশ্যক—সুন্দরমুখ উপরি পাওনা। ভদ্রলোকের কাছে বেশ চড়া মূল্য চাহিলাম। তিনিও নির্ব্বিবাদে ভালমানুষটির মতই সেই মূল্যই স্বীকার করিলেন। অগ্রিম টাকাও কিছু তিনি দিতে আপত্তি করিলেন না। মনে একটু আফ্‌শোষ হইল—হায়রে, আরো কিছু বেশী যদি চাহিতাম।

সেইদিন রাত্রি। আলো নিভাইয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছি বাতাসে উড়িয়া একখানি কাগজ আসিয়া পড়িল আমার পায়ের কাছে। তুলিতেই দেখিলাম সেই মেয়েটির ছবিখানি। আশ্চর্য্য হইলাম, টেবিলের টানা ড্রয়ারে রাখিয়াছিলাম বেশ মনে আছে। হতভাগা চাকরটা নিশ্চয়ই সিগারেটের

খোঁজে ড্রয়ার খুলিয়াছিল—সেই সময়েই ছবিটা বাহিরে ফেলিয়াছে। ভাগ্যে নষ্ট হইয়া যায় নাই। ভদ্রলোকের মৃতা কন্যার একমাত্র ছবি। ছবিটা তুলিয়া দেখিলাম—দেখিবার মত কিছুই নাই তথাপি কে জানে কেন কিছুক্ষণ সেই বোবা ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। আহা বেচারী—এত অল্পদিনেই বিদায় লইয়াছে এই রূপরসভরা পৃথিবী হইতে। কিছুই ওর জীবনে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। অবশ্য কীইবা এমন একটা উহার জীবনে ঘটিতে পারিত। অমন একজন নির্ব্বোধ অসুন্দর সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের জীবনের যাহা চরম পরিণতি তাহাই হইত। অতি নিরীহ কোনও কেরাণী নিতান্তই যাহার প্রয়োজন সময়মত দুটি রাঁধা ভাতের সেই উহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইত। সেই একটিমাত্র দিন জীবনে উহার বাঁশী বাজিত—আলো জ্বলিত—ফুলের মালা আসিত। তারপর আর কী? ঠাকুর চাকরহীন কেরাণীর সংসারে উদয়াস্ত খাটিবার পরে জ্যোৎস্না কিংবা ফুলের মালা দেখিবার বা উপভোগ করিবার সময় বা সখ উহার আর কোনও দিনই হইত না। তাহার চেয়ে এই মৃত্যুটা এমনই বা কি ক্ষতি হইয়াছে? ছাঁইপাশ কত কি ভাবিতেছি, ছোট টাইমপিসটার দিকে নজর পড়িতেই চমকিয়া উঠিলাম, প্রায় বারোটার কাছাকাছি। এতরাত্রে ছবিখানি হাতে লইয়া এসব কী

ভাবিতেছি—হাসি পাইল। টেবিলের পরে ছবিখানি চাপা দিয়া শুইয়া পড়িলাম। আলো নিভাইতেই পাশের জানালা দিয়া এক টুকরা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল ঘরের মেঝের পরে।

কেমন একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম। জ্যোৎস্নার আলো সরিয়া গিয়াছে তবু ঘরের মধ্যে একটা ফিকে অস্পষ্টতা। দেখিলাম একটি রমণী মূৰ্ত্তি আমার খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম না নিশীথ অন্ধকারে আমার ঘরে এ কে আসিল, চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল কোথায় দেখিয়াছি ইহাকে? শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিলাম—কে তুমি?

নিঃশব্দে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনি দ্বারা সে নির্দ্দেশ করিল আমার টেবিলের দিকে। দেখিলাম ফোটোখানির মেয়েটির সহিত ইহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

রমণী কহিল—উহা আমারই চিত্র।

কহিলাম—তুমি তো বাঁচিয়া নাই—শুনিয়াছি।

সে কহিল—সত্যই শুনিয়াছ—তোমাদের পৃথিবীর চোখে আমি এখন মৃতই—তথাপি পৃথিবীর বাহিরে যে বিশাল জগৎ আছে আমি তাহারই অধিবাসিনী।

একটু ভয় হইল—স্বীকার করিতেই হইবে। অৰ্দ্ধরাত্রে একাকী

পরলোকের অধিবাসিনীর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। কহিলাম এখানে আসিয়াছ কিসের টানে?

সে কহিল—বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে তাই আসিয়াছি তোমার কাছে। আসিয়াছি একটা প্রার্থনা লইয়া। তুমি ইচ্ছা করিলেই পূর্ণ করিতে পার।

বলিলাম—সাধ্যায়ত্ব হইলে না করিবার কোনও কারণ নাই।

ছায়া কহিল—ঐ চিত্রখানির দ্বারা তুমি কী করিবে?

কহিলাম—ছবি আঁকিব—তোমার পিতা আমাকে ভার দিয়াছেন—অগ্রিম টাকাও লইয়াছি—কাজেই আঁকিতেই হইবে।

রমণীর বিষণ্নমুখে হঠাৎ হাসির আভাস দেখা দিল—কহিল—চিন্তার কারণ নাই, ছবি আঁকা বারণ করিতে আসি নাই—তবে সে বিষয়ে আমার একটু নির্দ্দেশ দিবার আছে। ভাল করিয়া শোন!—

কৌতুহলী হইয়া সেই আলো অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন রমণীর পানে চাহিয়া রহিলাম—

সে কহিল—একটি কাহিনী শুনিবে!—তোমরা চিত্রকর—ভাল করিয়াই জান সংসারে অসুন্দরের কোনও মূল্যই নাই, বিশেষ সে সৌন্দর্য্যহীনতা যদি দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরের কন্যাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। কত বেদনা, কত লাঞ্ছনা কত

দুঃখ যে সে রূপহীনাকে ভোগ করিতে হয় তাহার ধারণা তোমরা করিতে পার না।

আমি মৃদু প্রতিবাদ করিলাম—তাহাতে মানুষের দোষ কোথায়? সুন্দরকে ভালবাসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম!

ছায়া কহিল—প্রতিবাদ কারও না। সুন্দরকে ভালবাসা স্বাভাবিক, তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু সে সুন্দরকে দেখিবার চোখ কোথায় তোমাদের? যাহা বলিতেছিলাম শোন—আমি যখন জীবিত ছিলাম তখন অসুন্দর ছিলাম! ছবিতেই দেখিতে পাইতেছ সাধারণ একখানি মুখ, যে দেখিত সেই আত্মহারা হইয়া চাহিয়া থাকিত না। গায়ের রং ছবিতে বুঝিতে পারিতেছ না—আমিই বলিয়া দিই—বর্ণ ছিল কালো, যাহাকে সকলে নিতান্তই কালো বলে এমনই কালো রং! 'কৃষ্ণকলি' ছিলাম—কিন্তু কালো হরিণ চোখ ছিল না। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি ছিল না! নিতান্তই সাধারণ কালোচুল!

ঘুম আসিতেছিল—কহিলাম—তোমার দীর্ঘ রূপবর্ণনা আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতেছে—একটু তাড়াতাড়ি সারিলে হয় না? ছায়া বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল—জানি, ধৈর্য্য থাকিবে না, হইত কোনও সুন্দরীর রূপবর্ণনা—দেখিতাম নিদ্রা ঘরের ত্রিসীমানায় নাই। কিন্তু যেহেতু আমারই গরজ সেহেতু আমার থামিলে চলিবে না। বিশেষ প্রয়োজন, তাই কথা কহিতেই হইবে।

কহিলাম—না, আর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না—তুমি বল—

কহিল—ধন্যবাদ। শোন, এমনই এক রূপহীনা কুৎসিতা বাঙ্গালীর মেয়ে ছিলাম আমি, পিতার অবশ্য কোনও দোষ নাই, সুন্দরী কন্যার পিতা তাঁহার কন্যাকে যেমন ভালবাসেন, আমার দরিদ্র উপায়হীন পিতা বোধহয় তাঁহার কুরূপা কন্যাকে তাহা-পেক্ষাও বেশী ভালবাসিতেন। কিন্তু দরিদ্র পিতার সে ভালবাসার কোনই মূল্য নাই সমাজের কাছে। সমাজ পিতাকে চোখ রাঙাইয়া কহিল—কন্যার বিবাহ দাও। কিন্তু সুন্দর অসুন্দর ধনী দরিদ্র সকল পাত্রই কহিল—হয় চাই রূপ না হয় রূপা!

তোমাকে বলিয়াছি এই দুইটার একটাও পিতার বা আমার ছিলনা, কাজেই বিবাহ হইল না।

আমি কহিলাম—ভাল লাগিতেছে তোমার কাহিনী, কথা শুনিয়া তোমাকে এত বুদ্ধিহীনা কিংবা নিরীহ মনে হইতেছে না।

ছায়া হাসিল, কহিল—অসুন্দর হইলেই বুদ্ধিহীনা হইব—ইহাও তোমরা ধরিয়া লও।—রূপহীনার অন্তর কে দেখিতেছে বল? যাহা হউক কাহিনী শোন :—

সমাজ পিতার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধকে ক্ষমা করিতে চাহিল না। সে রক্তচক্ষু করিয়া পিতার কার্য্যের কৈফিয়ৎ

চাহিল। উপায়হীন পিতা দিবারাত্রি মহাজনের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অবশেষে তাঁহার বাস্তুভিটাটুকু পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। আমি তাঁহার কুরূপা কন্যা—কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলাম আমার শুভ বিবাহ উৎসব। অবশেষে বিবাহের সময় পাত্রকে দেখিলাম—দেখিলাম বাস্তুভিটা বাঁধা দিয়া পিতা যাঁহাকে ক্রয় করিয়াছেন বাহিরে অন্ততঃ তাঁহাকে সকলেই সুন্দর বলিবে। দেখিয়া আমার অন্তর আরও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুন্দর অপেক্ষা অসুন্দরকে বরং মানাইয়া চলিতে পারিতাম। সুন্দরের পরে আজন্ম এমন বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল যে সুন্দরের পানে আর ভাল করিয়া চাহিতেই পারিতাম না। কিন্তু এত করিয়াও পিতা শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। পিতার নির্ব্বাচিত পাত্রটি আমাকে দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন এবং আমার রূপ-হীনতার বাবদ আরও কিছু দাবী করিলেন। পিতা নিরূপায়, তাঁহাকে কাটিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেও আর একটি পয়সাও পাওয়া যাইবে না—ইহা আমি জানিতাম, সকলেই জানিতেন—কিন্তু কেহই সাহায্য করিলেন না। বহুক্ষণ গোলযোগের পরে পাত্রটি বিবাহ সভা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই-ভাবে রাত্রি অতিবাহিত হইল। সংবাদপত্রে তোমরা পড়িয়া

থাক—এইরূপ ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ আর কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দায় উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়া আসেন। তাহা নিশ্চয়ই মনগড়া কাহিনী। অন্ততঃ আমার জীবনে এমনটি ঘটে নাই। রাত্রি প্রভাত হইল। পিতা আতঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছেন অন্যপূর্ব্বা কন্যার বিবাহ না দিতে পারার অপরাধে সমাজ তাঁহাকে কি শাস্তিই না দিবে। তাঁহার দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম, গভীর উদ্বেগে মাথার সব চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। দেহের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বনাশের পরে মানুষের চেহারা বুঝি এমনই হইয়া থাকে। নিঃশব্দে সেই আলো আঁধারের প্রভাতে আমি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। খিড়কীর পুকুরে ডুব দিলাম—আর উঠিলাম না।

আমি শিহরিয়া কহিলাম—ডুবিয়া আত্মহত্যা করিলে?

তরল হাসির সঙ্গে সে কহিল—তাহা ছাড়া আর কীই বা করিতে পারিতাম? সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের অশিক্ষিতা কুরূপা মেয়ে আমি। খোঁজ লইয়াছি পিতা আবার তাঁহার ভিটাখানি দায়মুক্ত করিয়াছেন। সেইখানেই আছেন। দুঃখে শোকে দিন কাটিতেছে এক রকম। কিন্তু গোল বাধাইল ঐ ছবি লইয়া।

আমি কহিলাম—কিসের গোল?

ছায়া কহিল—পিতা চাহেন ছবিখানি রঙ্গীন করিয়া

বাঁধাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিতে, তাহারই জন্য তোমাকে ভার দিয়াছেন।

কহিলাম—তাহা জানি।

সেইখানেই মুস্কিল বাধিয়াছে—আমি তাহা চাহিনা। ছবি যদি তুমি আঁকতেই চাও তবে ঐ ছবির ন্যায় আঁকিতে পারিবে না। আমি তোমাকে আমার সত্যকারের রূপ দেখাইব—সেই চিত্র তোমাকে আঁকিতে হইবে

কহিলাম—সে আবার কী—সত্যকারের রূপ কোনটা?

ছায়া কহিল—দেখ—

চাহিয়া দেখি কখন ছায়ার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অপরূপ এক রমণীমূর্ত্তি—রূপের ঐশ্বর্য্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিয়াছে। সুষমাময়ী সেই রমণীর পানে চাহিলাম—তাহার মুখে বিষণ্ণতার একটি সকরুণ হাসি—একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীও বুঝি মিশ্রিত আছে। ছায়াকে কহিলাম—এ কী তুমি?

সে কহিল—এই আমি! বাহিরের রূপটাই সকলের চোখে পড়িয়াছে, সকলে মুখ ফিরাইয়াছে। কিন্তু কুরূপা নারীর অন্তরের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে নাই। তাহারও অন্তর যে মাধুর্য্যমণ্ডিত হইতে পারে—তাহারও অন্তরে জাগিতে পারে নারীর মহিমাময় রূপ তাহা কেহ বিশ্বাস করে না। যে সৌন্দর্য্য-দেবতার দান বাহিরে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে, নিভৃতে তাহার

তুমি কি কেবল ছবি

মনোমন্দিরে সেই সুন্দর তাহাকে নিয়ত সাজাইয়াছে নব নব রূপে, সম্পদে, ঐশ্বর্য্যে। তুচ্ছ বাহিরের রূপ দুদিনে ঘুচিয়াছে কিন্তু আমার সেই ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণীমূর্ত্তি শাশ্বত হইয়া রহিয়াছে মৃত্যুর পরেও। তাই তোমার কাছে আসিয়াছি।

আমি অবাক হইয়া কহিলাম—আমি কি করিতে পারি? সে কহিল—একমাত্র তুমিই পারিবে। কারণ তুমি চিত্রকর। তুমি আমার এই সুন্দর কোমল মাধুর্য্যময়ী রূপকে তোমার তুলি ও রংয়ে অঙ্কিত কর। তাহাই থাক চিরন্তন হইয়া। পৃথিবীকে জানিতে দাও সত্যই আমি অসুন্দর ছিলাম না।

করুণায় মন ভরিয়া উঠিতেছিল—তবু কহিলাম—কিন্তু লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?

সে কহিল—না হয় নাই করিল বিশ্বাস। তথাপি আমার ঐ কুৎসিত ছবি তাহাদের চোখের সম্মুখে আর ধরিতে দিব না। আমি যে সত্যই কুরূপা নহি—আমার মধ্যে যে অপরূপের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত—সে কি কোনও দিনই কেহ জানিতে পারিবে না। তোমরা মিথ্যাই আমাকে বিচার করিয়া যে শাস্তি দিয়াছ তাহাই থাকিবে চিরন্তন হইয়া? ছায়ার কণ্ঠস্বর আদ্র শোনাইল। তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর পানে চাহিলাম, তাহার নয়নের কোণে জল ঝরিতেছে। বিষণ্ণ কোমল মুখে সেই অশ্রুবিন্দু সুন্দর দেখাইল।

আমি সেই অন্ধকারের মধ্যেই তুলি ও রং টানিয়া লইলাম। সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই অপরূপ অশ্রুমুখী তরুণী। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে সে যে কতখানি মহিয়সী ছিল তাহা বুঝিতেছি তাহার মুখের পানে চাহিয়া। তুলির টানে ছবি আঁকিতে লাগিলাম।

ক্রমে প্রভাত আসিল। প্রথম আলোর সঙ্গেই রমণী তাহার ছায়াকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কহিয়া গেল আবার রাত্রে আসিবে। এমনই করিয়া প্রতিরাত্রে অদৃশ্য পক্ষপুটে ভর করিয়া আমার গৃহে আসিত তাহারা। আমি ছবি আঁকিতে আঁকিতে তাহার সহিত কথা কহিতাম। অবশেষে একরাত্রে ছবি শেষ হইল। রমণীকে কহিলাম, দেখতো পছন্দ হইয়াছে কি না— নিজেকে চিনিতে পার কি ?

ছায়া হাসিল, কহিল—আমার চিনিতে ভুল হইবার কথা নয়। পৃথিবীতে থাকিতেও আমি উহাকে চিনিতাম। তোমরাই চিনিতে চেষ্টা কর। রূপসীর সহিত নূতন পরিচয় খারাপ লাগিবে না। তাহাকে কহিলাম ছবি যতই সুন্দর হউক— তোমাকেই আমার ভাল লাগিয়াছে বেশী। এই কয় সপ্তাহ তোমার মনের পরিচয় পাইয়া ভাবিতেছি এত সুন্দর সহজ সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য কখনও রূপসী তরুণীর মধ্যেও দেখি নাই।

তরুণী হাসিয়া কহিল—সুন্দরীর সংবাদ রাখি না। রূপ-হীনা তরুণীর অন্তর খুঁজিয়া দেখিলে দেখিবে ইহার অপেক্ষাও

অধিক ঐশ্বর্য্য আছে। কিন্তু এই কয়েকটা দিন পরীক্ষা করিবার মত সময় কোথায় তোমাদের! কালো রং চোখের অপ্রীতি ঘটায় যে!

আজ আর ছায়ার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। সত্যকথা শুনিবার শক্তি পাইয়াছি এই কয় দিনে। ছায়ার হাসিভরা মুখখানি মিলাইয়া আসিল। ডাকিলাম—সাড়া পাইলাম না।

পরের দিন প্রভাতের কথা আগেই বলিয়াছি। আমার নিকটে রহিল ছবিখানি। আমার শোবার ঘরের দেরাজের পরে তাহাকে রাখিয়া দিলাম।

সেদিন রাত্রেও ছায়া আসিল—

কহিল—পিতা ছবিখানি লইলেন না!

কহিলাম - না।

—তোমার খুব ক্ষতি হইয়া গেল।

কহিলাম—তা' হউক, তথাপি এ ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া মানিব না।

ছায়া সকৌতুকে কহিল—তাহার অর্থ?

গভীরস্বরে কহিলাম—সৌন্দর্য্যবিদ্ বলিয়া বৃথা যে গর্ব্ব করিতাম তাহা ভাঙ্গিয়াছ তুমি। সুন্দর অসুন্দরকে দেখিবার সত্যকারের দৃষ্টি পাইয়াছি; তাহারই স্মারকরূপে ছবিখানি থাকিবে আমারই কাছে।

ছায়া তরলস্বরে কহিল—ভাগ্যে আমার পার্থিব দেহকে আঁক নাই তাহা হইলে রাখিতে চাহিতে না।

ড্রয়ার টানিয়া দেখাইলাম ফোটোখানির অনুরূপ আর একখানি চিত্র আঁকা রহিয়াছে।

ছায়া এবার আর হাসিল না, কেবলমাত্র আমার দিকে পরিপূর্ণ ভাবে একটিবার চাহিল। দেখিলাম তাহার সেই দৃষ্টিতে অন্তরের সকরুণ কোমল বাণীটি চকিতে দেখা গেল।

ছায়া অস্পষ্ট হইল।

কহিলাম—আর আসিবে না!

কহিল—না।

ছায়া মিলাইল।

ছবিখানি ভাল করিয়া বাঁধাইয়া ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছি নীচে নাম দিয়াছি—'ছায়া'।

বন্ধুরা বলে—কার ছবি হে!

বলি—একটি মেয়ের!

তারা বলে—ভারী সুন্দর মেয়েটি তো।

মনে মনে অদৃশ্যলোকবাসিনীকে ডাকিয়া কহি—মানুষের এই প্রশংসা বাণীতে সুখী হইতেছ কি?

ছায়ার সকরুণ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির আভাস!

তৃপ্তির না ব্যঙ্গের কে বলিবে!

শিল্পী ও শিল্প

পূর্ণিমা তিথি, কলকাতার বাড়ীতে সান্ধ্য আসর জমে উঠেছে। বহু সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক বন্ধুদের সমাগমে আসর গরম। ঐতিহাসিক বন্ধু সম্প্রতি এসেছেন বাংলার এক অখ্যাত লুপ্তপ্রায় প্রাচীন পল্লী-অঞ্চল থেকে। আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত আছেন তিনি এক অপূর্ব্ব কাহিনী শোনাবেন। সেই জন্যেই আমাদের আজকের উৎসাহ, চাঞ্চল্য অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী। এমনি সময় বন্ধু তাঁর হাতের পুরাতন একখানি পুঁথি খুলতেই আমরা সকলেই তার পরে ঝুঁকে পড়লাম। বন্ধু বললেন পুঁথিখানির বিষয় বস্তু নাকি অপূর্ব্ব রহস্যময়—আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলাম!

—বহুদিন আগের কাহিনী, সেদিন বাংলাদেশের সর্ব্বত্র ছিল শান্তি ও সম্পদের প্রাচুর্য্য। দেশবাসী ছিল স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসে

অভ্যস্ত। এমনই যখন দেশের অবস্থা, তখন একদিন বলিষ্ঠ অশ্বের পরে সম্রাট বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে। রাজ্যে সর্ব্বত্র তাঁর সুশাসন, রাজ্যজুড়ে আনন্দ উৎসব। সম্রাট চলেছেন—আর পরম আত্মতৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে উঠছে। অবশেষে রাজ্যের সীমায় যেখানে পথের রেখা এসে মিশেছে বনের সঙ্গে, রাজা এসে উপস্থিত হ'লেন সেইখানে। তারপর কি মনে করে বনপথের রেখা ধরে অশ্বচালনা করলেন তিনি। পিছনে সমস্ত রাজ্যের পরে তখন অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণাভা।

বনের দু'ধারে পুষ্পিত লতাকুঞ্জ সম্রাটের মাথায় অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করছে। কোথাও বা সুদীর্ঘ সহকারের শীর্ষে শীর্ষে মাধবীর শুভ্র কুসুম বিকসিত। অন্যমনস্কভাবে সম্রাটের দৃষ্টি তাদের দিকে সঞ্চালিত হচ্ছে। সহসা তাঁর অশ্বের গতিবেগ সংহত হ'ল, বিস্মিত হয়ে তিনি চেয়ে দেখলেন বনের পাশে একটি ক্ষুদ্র মাটির গৃহ। গৃহখানি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, বনজ লতাগুচ্ছ আচ্ছাদিত গৃহের সম্মুখে মাটির অঙ্গন—তারই পরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন রমণী। রমণীর সর্ব্বাঙ্গে অলোকসামান্য লাবণ্য। সর্ব্বাঙ্গ তাঁর আভরণহীন, পরিধানের বস্ত্রখানি অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু জীর্ণ—মুখের দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য বিষাদে ম্লান, বৃহৎ কৃষ্ণ আঁখিযুগে অশ্রুর আভাস। সেই অপরূপা রমণী-মূর্ত্তিকে ঘিরে একটা করুণ শ্রীহীন রূপ ফুটে উঠেছে। ইন্দ্রজিত

একবার ইতস্ততঃ করলেন। তারপরেই সকল সঙ্কোচ পরিহার করে রমণীমূর্ত্তির কাছে এসে আনত অভিবাদন জানিয়ে বল্লেন—মা, তোমার কিসের দুঃখ? কিসের বেদনায় তোমার এমন সর্ব্বস্বহারা রূপ, তোমার এই সন্তানকে বল মা।

রমণী কেবলমাত্র তাঁর বিশাল নয়ন মেলে তাকিয়ে আছেন—কোনও কথাই বলেন না।

ইন্দ্রজিত বিব্রত হয়ে পড়লেন—কে এই আশ্চর্য্য রমণী! অকুণ্ঠিত দৃষ্টি ভঙ্গিমায় যে গভীর তিরস্কার প্রকাশিত সে কী মানবীর দৃষ্টিতে সম্ভব? একি বনদেবী—না রাজলক্ষ্মী? কিন্তু এমন হৃতসর্ব্বস্বরূপ কেন? তিনি আবার অনুনয় করলেন—মা তোমার পরিচয় দাও, তোমার দুঃখ দূর না করে আমি এখান থেকে উঠব না!

—"সম্রাট, জননীর দুঃখ দূর করা কেবলমাত্র আপনাতেই সম্ভব।"

ইন্দ্রজিত সচকিতে ফিরে তাকালেন পিছনে। দীর্ঘদেহ এক পুরুষ তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে—বয়স তাঁর পশ্চিমের দিকে হেলে পড়েছে। মাথার কুঞ্চিত কেশদামে শুভ্রতার আভাস! সবল বাহু—প্রতিভান্বিত ললাট। বেদনাভরা বিশাল আঁখিযুগল। প্রৌঢ়ের চোখ সুদূরে নিবদ্ধ—তিনি বলে চলেছেন—কিন্তু কই সম্রাট! ক্রন্দনরতা জননীর বেদনা তো

আপনাকে স্পর্শ করে না? দীর্ঘদিন, দীর্ঘরাত কেটে যায় মিথ্যা আয়োজনে—মার পূজার উপচার কোথায়? ইন্দ্রজিত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—কে আপনি? প্রৌঢ় উত্তর করলেন—আমি ধীমান। সবিস্ময়ে ইন্দ্রজিত প্রশ্ন করলেন—কে? শিল্পী ধীমান? বিনীতস্বরে প্রৌঢ় উত্তর করলেন—হাঁ সম্রাট; মায়ের অকৃতি সন্তান।

সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে সম্রাট বললেন—কিন্তু শিল্পী, ইনি কে?

করুণ হাসির সঙ্গে ধীমান উত্তর করলেন—সম্রাট! উপেক্ষিতা শিল্প-জননীর মৃন্ময়ী প্রতিমা!

—মৃন্ময়ী প্রতিমা? এ কী সত্য! এ কী সম্ভব শিল্পী?

ইন্দ্রজিত প্রতিমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রতিমাই তো! কিন্তু কি অপরূপ সৃষ্টি, জীবনের সুষমায় মণ্ডিত প্রতিমাখানি—বর্ণ বৈচিত্র্যে দেহ সৌকুমার্য্যে প্রাণবন্ত। চোখের তারায় অকথিত ভাষা এসে জমা হয়ে রয়েছে। রক্তিম ওষ্ঠাধরের ঈষৎ কম্পন বুঝি ধরা পড়ে। নির্ব্বাক হয়ে সম্রাট ইন্দ্রজিত দেখতে লাগলেন সেই মাতৃমূর্ত্তির স্বর্গীয় সুষমা। অবশেষে শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন—শিল্পী তোমার অলৌকিক শিল্পনৈপুণ্যকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু এ বনভূমি আর নয়—চল আমার প্রাসাদে, সেখানে তুমি তোমার কাজ করবে। তোমার নব

নব সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে আমার রাজ্যের সম্পদ বাড়বে। শিল্প-জননীর প্রসন্ন হাস্যে আমার দেশ হবে উজ্জ্বল। ধীমান শান্তহাস্যে বললেন—জয় হোক সম্রাটের। প্রাসাদ নয়—এই বনভূমিই আমার শিল্পসাধনার পটভূমিকা। প্রাসাদের বিলাস উৎসবে সাধনা আমার ব্যাহত হবে প্রতিক্ষণে। সম্রাটের স্মরণ মাত্রেই আমি যাব তাঁর রাজসভায়।

ইন্দ্রজিত প্রতিমার পানে তাকিয়ে বললেন—কিন্তু শিল্পী, দেবীর মুখের ঐ কারুণ্য ও বিষাদকে এবার অপসারিত কর। অষ্টালঙ্কারে তাঁর দেহ কর ভূষিত, পরিধানে দাও মহামূল্য পট্টবস্ত্র।

ঈষৎ হাসির সঙ্গে শিল্পী বললেন—তাই হবে সম্রাট। যেদিন রাজ্যে সর্ব্বত্র মার অভিষেক উৎসব সুরু হবে, সেইদিনই জননী আবার ঐশ্বর্য্যশালিনীরূপে দেখা দেবেন। মায়ের দৈন্য দূর করা তো একমাত্র শক্তির কাজ নয় সম্রাট—সাধনার কাজ।

ইন্দ্রজিত প্রাসাদের দিকে অশ্ব ফেরালেন।

দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘদিন সম্রাট ইন্দ্রজিত সুচারুরূপে রাজ্যশাসন কার্য্য পরিচালনা করেছেন। সাম্রাজ্য তাঁর ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। রাজ্যের সমৃদ্ধির

সঙ্গে .সঙ্গে দেশময় গড়ে উঠেছে শিল্পকলার এক নূতন যুগ। তরুণ শিল্পীর দল রাজানুগ্রহে পরিপুষ্ট হয়ে রাজ্যের সর্ব্বত্র গড়ে তুলেছে এক নূতন ইন্দ্রলোক। সম্রাটের আকাঙ্ক্ষামত তারা রাজপ্রাসাদকে সুসজ্জিত করেছে—দেবমন্দির নূতন গাম্ভীর্য্য লাভ করেছে। দেশের প্রতিটি আনন্দ উৎসবে শিল্পীদের আহ্বান আসে—সপারিষদ সম্রাট তাদের নির্দ্দেশ দান করেন, সেই অনুযায়ী শিল্পীরা করে উৎসবসজ্জা। দেশ বিদেশে এই শিল্পানুরাগী সম্রাটের খ্যাতি রটল। ভাট ও চারণের মুখে মুখে প্রচলিত হল যত প্রশস্তিগাথা। সম্রাট তৃপ্ত হয়ে ভাবেন, শিল্পকে এতদিনে করেছি সুপ্রতিষ্ঠিত।

শারদশ্রী এসে সমস্ত পৃথিবীকে শোভন করে তুলেছে। ইন্দ্রজিত চলেছেন পরিভ্রমণে—অপরাহ্ণের ধূসর আলোয় কৃষ্ণ অশ্ব তাঁর চলেছে। রাজ্যভরা শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন—অস্তগামী সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে রাজদেবদেউলের সুবর্ণমণ্ডিত শিখরে। ইন্দ্রজিতের মনে জয়ের আনন্দ, রাজ্যের ঐশ্বর্য্য তাঁর দর্পিত মনকে ভরে তুলেছে। অশ্ব চলেছে চঞ্চল পদক্ষেপে দক্ষিণে ও বামে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার শ্রেণী রেখে।

সহসা ইন্দ্রজিতের মনে জাগল এক বিস্মৃত অতীতের কাহিনী—রাজপথ ছেড়ে অশ্বকে পরিচালিত করলেন বনপথের দিকে। পুরাতন দিনের সেই প্রিয়পথ। ইন্দ্রজিতের উৎসুক

দৃষ্টি ব্যর্থ হল না। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের সেই ক্ষুদ্র কুটির আজও দাঁড়িয়ে আছে তেমনি—আর কি বিস্ময়! সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা তেমনই দাঁড়িয়ে আছে আজও। তেমনি বিষাদ-মলিনা, তেমনি জীর্ণ-বসনা, আভরণ-হীনা। ইন্দ্রজিত কুটির প্রাঙ্গণে অশ্বগতি সংহত করলেন। প্রতিমার পাশে এসে দাঁড়াতেই কুটিরের মধ্যে হতে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ শিল্পী। দেহে জরার আক্রমণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—দৃঢ় দেহ ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে সম্মুখে। মস্তকের কেশ শুভ্র। কেবল মাত্র চোখে সেই পুরাণো দিনের শান্ত বিষাদভরা দৃষ্টি। ধীমান সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন। সম্রাট সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—শিল্পী! এ তোমার কি আচরণ? এর অর্থ কি?

শান্তস্বরে বৃদ্ধ বললেন—অসঙ্গতি কোথায় সম্রাট? রূঢ়স্বরে সম্রাট বললেন—দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে শিল্পদেবীর ঐ নিঃস্ব মূর্ত্তি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আমার রাজ্যে শিল্পকলা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এক যুগের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে দেশের সর্ব্বত্র শিল্প আজ সমাদৃত। দলে দলে গড়ে উঠেছে তরুণ শিল্পীরা—তবু প্রতিমার এমন রূপ কেন? কেন আজও তাঁর নয়নে নেই প্রসন্নতার আভাস? কেন দেহে নেই রত্নালঙ্কার। বোঝাতে পার এর অর্থ কি?

শিল্পীর উদার নয়নে বেদনার আভাস। গাঢ়কণ্ঠে বললেন সম্রাট, মায়ের এ রূপ তো আজও ঘোচেনি। আজও তাঁর দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি—প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে কেমন করে? সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আজ যে শিল্প বর্ত্তমান, তাকে সৃষ্টি করেছ তুমি তোমার রাজকীয় নির্দ্দেশে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তি সেখানে নেই। বাংলার অতীত ইতিহাসের দিকে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত কর—দেখবে সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত্ত শিল্পকলার কি উদার অভ্যুদয় ঘটেছিল রাজশক্তির সহায়তায়, সেদিন শিল্পজননীর সুকুমার ললাটে যে জ্যোতির তিলক অঙ্কিত হয়েছিল তারই প্রভাব বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করে বৃহত্তর ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। বঙ্গজননীর সে জয়যাত্রায় রাজার শক্তি আর সাধকের সাধনা এসে মিলেছিল একের সঙ্গে অপরে। কেবলমাত্র আড়ম্বরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না সম্রাট, প্রয়োজন চিত্তের ঐকান্তিকতার, নিবিড় তপস্যার। ক্রোধে বিরক্তিতে ইন্দ্রজিতের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। তবু সংযত স্বরেই তিনি বললেন—ঐকান্তিকতার অভাব তুমি কোথায় দেখেছ শিল্পী?

ধীমান উত্তর দিলেন—তোমার চোখেও এ ধরা পড়তো সম্রাট যদি না ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার তোমার দৃষ্টিকে অন্ধ করে ফেলত।

ইন্দ্রজিত দৃঢ়স্বরে বললেন—অর্থহীন কথা আমি শুনতে চাই না। আগামী পূর্ণিমা রাত্রে আমি এই মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করবো আমার রাজ্যে উপযুক্ত সমারোহে। তুমি তোমার প্রতিমার মুখে প্রসন্নতা আনো তোমার তুলির টানে—রত্নালঙ্কারে ভূষিতা মায়ের আনন্দ মূর্ত্তি আমি সবার সম্মুখে প্রকাশ করতে চাই। এ আমার অনুরোধ নয় শিল্পী এ সম্রাট ইন্দ্রজিতের আদেশ।"

মাথা নত করে ধীমান বললেন—তাই হবে সম্রাট, পূর্ণিমা তিথিতেই মার প্রতিষ্ঠা হবে সাম্রাজ্যে।

রাজ্যে ফিরে ইন্দ্রজিত আহ্বান করলেন রাজ্যের স্থপতিদের। বললেন—আমার রাজ্যে আজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুচারুরূপে কিন্তু তাঁকে দেবীর মর্য্যাদা দিতে চাই আমি। আমার এ কাজে সহায়তা করবে তোমরা। শিল্পদেবীর জন্য গড়বে এমন দেউল যা ভুবনে হবে অতুলনীয়। আমারই নির্দ্দেশমত সৃষ্টি হবে এই মন্দির যা আমাকে করবে অমর এই বিশ্বে। অভিবাদন করে শিল্পীদল চলে গেল। দিবারাত্রি পরিশ্রমে তারা গড়তে লাগল সেই দেব-দেউল। অজস্র অর্থব্যয় হতে লাগল রাজকোষ হতে। শত শত শিল্পীর চারু কুশলতায় মন্দিরের সৌন্দর্য্য অপরূপ হয়ে উঠল। প্রস্তরের তোরণে তোরণে কারুকার্য্য। শঙ্খ ও পদ্মলতায় মন্দিরের দ্বার হল শোভন। মন্দিরের ভিতরে—ঠিক মধ্যস্থলে রচিত হল এক স্বর্ণকমল। থরে থরে তার

সুবর্ণদল বিকশিত হয়ে উঠেছে। তারই পরে প্রতিষ্ঠা হবে দেবীর।

অবশেষে একদিন দেউল গড়া হোল সমাপ্ত। ধীমানের কাছে এল রাজার আদেশ। পূর্ণিমা তিথি নিকটে এসেছে! শিল্পী কি সজ্জিত করেছেন মাতৃমূর্ত্তিকে? সসম্ভ্রমে শিল্পী সম্রাটের কাছে নিবেদন করেছেন—পূর্ণিমা তিথিতেই দেবী প্রতিষ্ঠিত হবেন। রাজার অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি প্রতিমাকে সজ্জিত করে-তুলেছেন বস্ত্র ও অলঙ্কারে। মাতৃমূর্ত্তির নব রূপায়নে তাঁর সাধনা সুরু হয়েছে!

রাজ্য জুড়ে সাড়া পড়েছে উৎসবের! দলে দলে সজ্জিত নরনারী রাজপথ মুখরিত করে চলেছে! রাজকোষের অজস্র অর্থব্যয়ে, অপরিসীম পরিশ্রমে নির্ম্মিত হয়েছে যে অপরূপ দেউল সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে আজ শিল্পজননীর মূর্ত্তি—শিল্পীশ্রেষ্ঠ ধীমানের সাধনালব্ধ প্রতিমা। কি অপরূপ হবে তাঁর মাধুর্য্য কি অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য সে প্রতিমার প্রতি অঙ্গে বিরাজমান! কি লালিত্য—কি বর্ণ-বৈচিত্র্য। সমস্ত তরুণ শিল্পীর প্রাণে অসীম আগ্রহ। কল্পনার স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলেছে তারা আপন আপন মনে।

ক্রমে সময় এলো কাছে। ইন্দ্রজিত এসেছেন দেউলে, বিদেশ হতে এসেছে অগণিত আমন্ত্রিত অতিথি। সহস্র

শিল্পী ও শিল্প

প্রতীক্ষমান নরনারী অধীর আগ্রহে সময় গণনা করছে। দূরে দেখা দিল রাজপ্রেরিত চতুর্দ্দোলা। রত্নখচিত রেশমের আবরণে সে চতুর্দ্দোলা উজ্জ্বল। পূর্ণিমার প্রথম জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার পরে। আর তারই পাশে পদব্রজে আসছেন শিল্পী ধীমান রাজপ্রেরিত রথ তিনি অস্বীকার করেছেন। শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র উত্তরীয় ততোধিক শুভ্র দেহবর্ণকে আবরিত করেছে। বিপুল জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল শিল্পীর। ধীমান এসে দাঁড়ালেন মন্দিরের প্রাঙ্গনে। তাঁর নির্দ্দেশমত চারজন তরুণ শিল্পী এল দেবীমূর্ত্তিকে নিয়ে যেতে মন্দিরের ভিতরে। দেবীমূর্ত্তিকে ঘিরে এক সুক্ষ্ম রেশমের আবরণ তাঁর দেহকান্তি ও সুন্দর মুখশ্রীকে আড়াল করে রেখেছে। সন্তর্পণে তারা বহন করে নিয়ে গেল সেই অপরূপা দেবী প্রতিমাকে। স্থাপন করা হল তাঁকে সেই স্বর্ণ কমলের পরে। ধূপের ধোঁয়ায়, অগুরুর সুবাসে মন্দির ভরে উঠেছে। শিল্পী ইন্দ্রজিতকে অনুরোধ জানালেন দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর তাঁর আচ্ছাদন অপসারিত হবে। সম্রাট সম্মতি জ্ঞাপন করলেন! যথারীতি পুরোহিতের দ্বারা অভিষেক শেষ হয়ে গেল দেবীর। অবশেষে এল সেই পরমক্ষণ। অকম্পিত পদে শিল্পী এগিয়ে গেলেন প্রতিমার দিকে। ধীরে ধীরে উন্মোচন করলেন তাঁর আবরণ। উৎসুক জনতার সহস্র আঁখি প্রতিফলিত হল দেবীমূর্ত্তির পরে। পট্টবস্ত্রে অলঙ্কারে

ভূষিতা শ্রীময়ী দেবী প্রতিমা—দক্ষিণ হস্তে তাঁর তুলিকা, বামহস্তে বাটালি। কিন্তু তাঁর সর্ব্বদেহ বেষ্টন করে এক সুদৃঢ় বন্ধন। চরণ যুগল হতে সুরু করে দেবীর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সেই বন্ধন উঠেছে। বেদনায় প্রতিমার মুখ বিবর্ণ। শিল্পীর সুনিপুণ তুলির টানে অঙ্কিত সেই বেদনার চিত্র দর্শকের হৃদয়কে অভিভূত করে দিল।

ক্ষণপরে ইন্দ্রজিত বজ্রস্বরে প্রশ্ন করলেন—শিল্পী এর অর্থ কি? কিসের বন্ধন? অকম্পিত স্বরে শিল্পী উত্তর করলেন—সম্রাট এ বন্ধন তোমারই সৃষ্টি।

"তার মানে কি জানতে চাই!"

"সম্রাট! দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তুমি একদিন শপথ করেছিলে শিল্পজননীর বেদনা মোচন করার। কিন্তু এই দীর্ঘ দিনে তুমি শিল্প-প্রতিষ্ঠার নামে কেবলমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছ।"

"শিল্পকে গড়ে তুলিনি আমি?

"গড়েছ, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করনি তাতে। শিল্পীদের সে স্বাধীনতা কোথায়? কোথায় তাদের সাধনা ক্ষেত্র। এ কেবল তোমার খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য শিল্পের অবমাননা। দিনে দিনে বেড়েছে তোমার স্থপতিদের মানসিক পঙ্গুতা আর তারই সঙ্গে এসে মিশেছে তোমার ঐশ্বর্য্যের বিকার। শিল্পীর চিত্তের অমিত

সম্পদ গেছে হারিয়ে। জননীকে ভূষণে সজ্জিত করেছ কিন্তু তোমার শাসনের নাগপাশে তাঁকে করেছ বন্দিনী। কলালক্ষ্মীর মৃত্যু ঘটেছে—তোমার সাম্রাজ্যে তাই মায়ের এই রূপই হ'ল প্রতিষ্ঠিত। নিয়ত তাঁর অন্তর হ'তে জীবনের জন্য যে আকুল রোদন ধ্বনিত হবে—যদি কখনও কোনও ভক্তপ্রাণে জাগে বেদনা—তারই সাধনায় ঘটবে দেবীর মুক্তি।

ইন্দ্রজিত বললেন—প্রতিমার এ রূপ তুমি সংস্কার কর—অন্যথায় তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

নির্ভীক হাস্যে ধীমান উত্তর করলেন—"সাম্রাজ্য বিনিময়েও তুমি শিল্পীর তুলি ক্রয় করতে পার না সম্রাট। মায়ের এই রূপায়ন আমার সাধনালব্ধ জ্ঞান।"

রাজার ক্রুদ্ধ ইঙ্গিতে প্রহরী এসে শৃঙ্খলিত করল শিল্পীকে। উৎসব গেল ভেঙ্গে—বেদনার্ত্ত জনতা ফিরে গেল গৃহে।

বাইরে তখন পূর্ণিমার অজস্র আলোর জোয়ার।

শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজা না করে উপায় নেই। ধীমানের প্রাণের বিনিময়ে গড়া সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা বহুদিন ধরে পূজিতা হয়ে এলেন। অবশেষে একদিন আত্মগোপন করলেন মৃত্তিকার স্তূপের আড়ালে।

পুঁথির লেখা এই পর্য্যন্তই। বন্ধুবর স্তব্ধ হলেন, আমাদের মুখেও কথা নেই। আজিকার এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের

পানে তাকিয়ে শুধু মনে হোল ধীমানের আত্মত্যাগ কি আজও সার্থকতা লাভ করবে না? কত যুগ, কত শতাব্দী অতীত হয়ে গেছে। কোথায় সেই ভক্ত সাধক? কার একান্ত সৌন্দর্য্য সাধনায় শবে প্রাণসঞ্চার হবে! সেদিন কত দূরে?

দহের গভীর কালো জল কেবলই পাক খাইয়া ঘুরিতেছে, বিরাট একটা ঘূর্ণি! এক টুকরা খড় পরিলে স্রোতের তীব্রতায় শতটুকরা হইয়া যায়। কূল নাই, পার নাই, দিগন্তবিস্তারী সেই দহ। কালো জলে ঢেউ উঠিতেছে পড়িতেছে—তীব্র স্রোতের আঘাতে থাকিয়া থাকিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ভীষণ শব্দে! দহের পাশাপাশি কেহ ঘর বড় একটা বাঁধে না। প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর আশঙ্কা। বর্ষাকালে দহের রূপ হয় ভয়ঙ্কর সুন্দর। উপরের জমাট কালো মেঘ নামিয়া আসে দহের বুকে—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ স্তরে স্তরে নমিত হইয়া আহ্বান জানায় দহের অতল জলরাশিকে। দহের জল উর্দ্ধে বাহু বাড়ায় মেঘকে স্পর্শ করিবার জন্য—কিন্তু মেঘ ও জলে স্পর্শ ঘটিবার পূর্ব্বেই সুরু হয় বিষম বিপ্লব। মেঘের বুকে দেখা দেয় বিদ্যুতের চঞ্চল রেখা। দুরন্ত বেগে উত্থিত বারিরাশি দহের বুকে সহস্রধারায়

ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে দিগন্ত কাঁপিয়া ওঠে। দহের বুকে নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কেহ নৌকা লইয়া যাতায়াত করে না। তেমন হুঁসিয়ার মাঝি না হইলে যে কোন্ মুহূর্ত্তে নৌকা ঘূর্ণির মধ্যে যাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। আর একবার নৌকা যাইয়া পড়িলে উদ্ধার পাওয়া যায় না, কেহ কখনও উদ্ধার পায় নাই। অপমৃত্যুতে কত লোক যে মরিয়াছে ঐ দহের জলে তাহার ঠিকানা নাই। গ্রামে এখন যাহারা বাস করে কেহ বড় একটা দহের পাশে যায় না। দহ তাহাদের প্রয়োজনে আসে না। গ্রামের অপর পাশ দিয়া যে নদী বহিয়া গিয়াছে তাহারই জলে তাহাদের অভাব মিটিয়া থাকে। নদীতে মাছ ধরে—বাইচ খেলে ছেলেরা সাঁতার কাটে—ঝাঁপাঝাঁপি করে—নদী সস্নেহ কৌতুকে তাহাদের সকল দুরন্তপণা সহ্য করে। কে বলিবে এই নদীরই অপর অংশ বক্রগতিতে গিয়া দহের সৃষ্টি করিয়াছে—সেইজল পাগলের মত কেবলই অশান্ত আঘাতে আঘাতে সকলকে ভীত করিয়া তুলিতেছে? তবুও দহের জল নিতান্তই সঙ্গীহীন নহে—এখনও মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহরে দুরন্ত বালকের দল আসিয়া জোটে—দহের তীরে পুরাতন বটগাছের নীচে মেলা বসায়। বটগাছের পুরাতন শিকড়গুলির মাটির সহিত কোনও সংস্রব নাই—দহের জলের উপরে শূন্যে প্রসারিত। দুঃসাহসিক বালকেরা তাহার উপরে বসিয়া দোল খায়—নীচের জলের পানে

তাকাইয়া আহ্লাদের আনন্দের সীমা থাকে না—ছোট ছোট ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বালক কণ্ঠের কোলাহলের মধ্যে দ্বিপ্রহর কাটে। দ্বিপ্রহরে জলচর পাখীর দল—কত মাছরাঙা কত পানকৌড়ি—দহের জলে তাহাদের প্রাত্যহিক উৎসব সভা জমায়। দহের একটা পাড় জুড়িয়া ভাঙ্গন কার্য্য চলিয়াছে—অপর পারের স্রোত প্রায় নিস্তরঙ্গ। তরতর করিয়া স্বচ্ছ জলরাশি বহিয়া চলিতেছে—সেদিকে একটা অতি পুরাতন বাঁধা ঘাট আছে। শ্যাওলায় ঢাকা—পিছল। দৈবাৎ পা ফসকাইলে আর উপায় নাই। একেবারে অগাধ জলে।—সিঁড়ির ফাটলে ফাটলে জন্মিয়াছে বট অশ্বথের অসংখ্য চারা—আগাছাগুলি বাড়িতেছে দিনের পর দিন সতেজে ও সবেগে। সিঁড়ির ধাপগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া একেবারে শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। কেহ আর ভরসা করিয়া সেখানে আসে না। কখন ঘাট দহের জলে তলাইয়া যাইবে স্থিরতা নাই। কবে কোন খেয়ালী ধনীর অর্থে গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সোপান—আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যাহার অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল বহুদিন হইল সে বিদায় লইয়াছে—তাহার বংশধরেরাও কেহ আছে বলিয়া জানি না।

আমি দহকে বড় ভালবাসি। শিশুকাল হইতেই দহের সহিত আমি পরিচিত। দহের আর্দ্রস্নেহে বাড়িয়া উঠিয়াছি

কত ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। দহের জলে পা ডুবাইয়া ঘণ্টার পরে ঘণ্টা অনুভব করিয়াছি দহের শীতল কোমল স্পর্শ। আর চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি দহের ওপারে বিরাট ঘূর্ণির উচ্ছ্বাস। জল উঠিতেছে পড়িতেছে—ফুটন্ত জলের মত টগবগ টগবগ করিতেছে। আর থাকিয়া থাকিয়া মৃদুশব্দে কখনও বা প্রচণ্ড শব্দে পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। চাহিয়া চাহিয়া তন্ময় হইয়া যাইতাম। আমার বালক হৃদয়ের কোন অদৃশ্য তন্ত্রীতে সুর বাজিতে থাকিত।

তারপরে জীবন সংগ্রামের স্রোতে দূরে দূরে ভাসিয়া গিয়াছি—তবুও দহকে ভুলি নাই—ভুলিতে পারি নাই। মায়াবিনী আপন অপরূপ নৃত্যের নূপুর বাজাইয়া, জল তরঙ্গে কঙ্কণঝঙ্কার তুলিয়া কেবলই আমাকে আহ্বান করিয়াছে—নিকটে ডাকিয়াছে। জাগ্রতে হয়তো বা তাহাকে ভুলিয়াছি—স্বপ্নে সে আমাকে দেখা দিয়াছে—তাহার উদ্দাম জলস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। অবশেষে একদিন ছুটির প্রারম্ভে দহকে বড় বেশী মনে পড়িতে লাগিল। সহরের কোলাহল আর ভাল লাগিতেছিল না! দহ আমাকে টানিতেছিল। আমার চিন্তাক্লিষ্ট উত্তপ্ত ললাটে তাহার শান্ত পরশ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। এক শরতের প্রসন্ন সন্ধ্যায় আমি আমার গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম।

দহ

অনেকদিন পরে আবার দহের সহিত আমার দেখা। সেই ভগ্ন সোপানের পরে ধীরে ধীরে আসিয়া বসিলাম। দহের রূপ বদলায় নাই। বর্ষার প্রাবল্যে তাহার স্রোত আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। ভাঙ্গন বাড়িয়াছে আরও বেশী। একটি মুহূর্ত্তও বাদ পড়িতেছে না। প্রচণ্ড শব্দে পাড় ভাঙ্গিতেছে। তরঙ্গময়ীর রঙ্গ বাড়িয়াছে। আমি সেই পুরাতন দিনের মত দহের জলে পা ডুবাইয়া বসিলাম। গভীর কালো জল সস্নেহে তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত মনটা একটা গভীর আনন্দে নীরব হইয়া রহিল। আকাশে শারদ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না। দহের বুকে হাজার হাজার মাণিক্যের দ্যুতি জ্বলিতেছে। দহের সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো জড়োয়া অলঙ্কার।

একটি কাহিনী জানিতাম দহের সম্বন্ধে। কাহিনীর নায়িকা রূপসী। এই দহের সহিত ছিল তাহার গভীর সখ্য। দহের কালো জলেই তাহার দেহের লাবণ্য মিশিয়াছে। তাহারই মাধুরিমা অঙ্গে ধরিয়া দহ এমন লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল দহের পাতালশয্যা ত্যাগ করিয়া রূপসী রত্নমালা আমাকে তাহার চমৎকার কাহিনী শোনাইবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে। বিবাহদিনের বিচিত্র জড়োয়া গহনা তার সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিতেছে! চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম সেই অতীত

দিনের কাহিনী। রূপসী দহ কল কল স্বরে যেন সেই গল্পই করিতেছে রত্নমালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া।

অনেক দিন আগের কথা। দহের ওপারে তখন এমন ভাঙ্গন ছিল না। না থাকিবার কারণও ছিল—সমগ্র দহের উত্তর দিক জুড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল এক বিশাল প্রাচীন প্রাসাদ। দেউড়ি, উদ্যান, কাছারি ঘর—নাচঘর—ভিতরের চক মিলানো দালান সব মিলিয়া সে প্রকাণ্ড সৌধ এক বিরাট আভিজাত্য ঘোষণা করিত। আমাদের কাহিনী যখন সুরু তখন সে আভিজাত্যের দেহে দারিদ্র্যের আক্রমণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে একদা পরমরূপসী রমণীর যৌবন-সৌন্দর্য্যময় দেহকে যেমন করিয়া জরা আক্রমণ করে। তথাপি সেই ঝরিয়া পড়া রূপকে প্রসাধিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা তখনও চলিত। বার্দ্ধক্যের দেহে অঙ্গরাগ মাখাইলে যেমন দেখিতে হয় তেমনই দেখিতে হইত। পিছনের বাগানে ভৃত্যদের জন্য নির্ম্মিত যে বিরাট একতলা দালানটি ছিল সেটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বৃহৎ সর্পকুল দিব্য আরামে বাস করিতে সুরু করিয়াছে। আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে সে উদ্যান। সেখানে কেহ বড় যায় না। আর যাইবেই বা কে ? বাড়ীতে থাকিবার মধ্যে রায়রায়ান প্রতাপ রায় আর তাঁহার একমাত্র পৌত্রী রত্নমালা। রায়রায়ান নবাবী আমলের উপাধি। উপাধিটা আসিয়াছিল যখন ঐশ্বর্য্য ও

দম্ভে রায়বংশ সমগ্র পরগণাটার মালিক তো হইয়াছিলই—তাহাদের বিক্রমে বাংলার সুবেদারও একটু শঙ্কিত থাকিতেন। সেকালে জমিদারের প্রতাপ এমনই জিনিষ ছিল। সকাল হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত রায়বাড়ীর সব কয়টা কক্ষ গম গম করিত। মহাল হইতে নায়েব আসিয়াছে সংবাদ লইয়া কোথায় ফসল ভাল হয় নাই—কোথায় মোড়ল দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দমন করিবার উপায় কী, আদায়পত্র নিয়মমত চলিতেছে কি না—এমনই সব খবরে কাছারী ঘর সরগরম থাকিত। সন্ধ্যায় বসিত রায়বংশের বিলাস উৎসব সভা। নাচঘরে জ্বলিত রঙীন বেলোয়ারি আলোর ঝাড়। সোনার আতরদানের পরে তাহার আলো প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। ফরাসের পরে সারি সারি তাকিয়া হেলান দিয়া বসিতেন রায় বংশের উত্তরাধিকারীরা ও তাহাদের বন্ধুবর্গ। বাঁয়া তবলা, পাখোয়াজ ও তানপুরার সহিত বাইজীর সুললিত দেহের সুন্দর নৃত্য চলিতেছে—তাহার দেহের অলঙ্কারের পরে আলো জ্বলিতেছে। ঘন ঘন প্রশংসাধ্বনি উঠিতেছে। সরবৎ সিরাজী কোনটারই অভাব নাই। ভিতর মহলে অন্তঃপুরচারিণীদের ত্রস্ত আয়োজন চলিয়াছে। রান্না-বাড়ীর বিপুল প্রাচুর্য্য। অতিথি অভ্যাগত আশ্রিত প্রজাবৃন্দের জন্য উদার অবারিত নিমন্ত্রণ। যাহার খুশী পাতা পাড়িয়া খাইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন কেহ অনুভব করে না।

বৃদ্ধ প্রতাপ রায় চোখ বুজিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে হয়তো সেই অতীতের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। নাতিনী আসিয়া কহিল—দাদু দেখেছ দহের জল কতটা বেড়েছে? আর ঘূর্ণি উঠেছে কি ভীষণ? এত চমৎকার লাগে দেখতে। দহের উপরেই জমিদার সৌধের প্রকাণ্ড বারান্দা আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে দহ একেবারেই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। রায়রায়াণ প্রাসাদের এই অংশে আজকাল আর বসবাস করেন না। প্রাসাদের সম্মুখের অংশেই দাদু নাতিনীর যথেষ্ট কুলাইয়া যায়। কেবল মাঝে মাঝে রত্না এ পাশের ঘরগুলিতে আসিয়া দাঁড়ায়। বারান্দা অতিক্রম করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস হুহু করিয়া আসিতেছে। দহের প্রচণ্ড আলোড়নে প্রাসাদের এই অংশে একটা মৃদু কম্পন স্থির হইয়া দাঁড়াইলে অনুভব করা যায়।

নাতিনীর কলকণ্ঠে রায়রায়ান চোখ মেলিয়া রত্নার মুখের দিকে চাহিলেন! অপূর্ব্ব রূপসী কন্যা। অভিজাতের ঘরেই বুঝি ভগবান রূপ পাঠাইয়া দেন। দীর্ঘায়ত কালো চোখে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। কোমল রক্তাভ সূক্ষ্ম ওষ্ঠপুটে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশরাশি পিঠ আবৃত করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রতাপ রায়ের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আহা! এমন রত্নকে তিনি

কোথায় দিবেন কাহার হাতে ? রায় পরিবারের ঐশ্বর্য্যের সহিত বীর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। সোনার কমলকে কি শেষে দহের কালোজলে ভাসাইয়া দিতে হইবে।

রত্না দাদুর সজল চোখ দেখিয়া দুঃখ পাইল। তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—দাদু আজ শরীর খারাপ লাগছে ?

নাতিনীর মুখে বেদনার আভাস দেখিয়া দাদু জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—নারে পাগলি। শরীর আমার লোহায় গড়া। একী খারাপ হতে পারে ?

রত্না প্রশ্ন করিল—তবে চুপ করে রয়েছ যে !

ভাবছি তোর বিয়ের কথা দিদি।

সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না দাদু—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

সে বেশ ভাল কথা দিদি। বুড়োতে যদি তোর আপত্তি না থাকে তবে আমি বেঁচে যাই বলিতে বলিতে প্রতাপ রায় হাসিয়া উঠিলেন। প্রাচীন প্রাসাদের শূন্য অলিন্দে অলিন্দে সে হাসি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বাহিরের দরজার পাশ হইতে সাড়া দিল রায়বংশের পুরাতন ভৃত্য বলাই—কহিল—কর্ত্তামশাই, ছোটতরফের বাবু দেখা করতে এসেছেন।" বলাইয়ের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন

দাদু ও পৌত্রী দুইজনেই। ছোট তরফের বাবুর পক্ষে যাচিয়া আসিয়া প্রতাপ রায়ের সহিত দেখা করিতে চাওয়া যে কতখানি বিস্ময়কর ব্যাপার তাহা কেবলমাত্র দাদু ও নাতিনী নহে সমগ্র পরগণার লোকেই জানিত। বংশপরম্পরা যে বিবাদ ও বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল উভয় তরফের মধ্যে তাহাই চরমে আসিয়া দাঁড়াইল প্রতাপ রায় ও ছোটতরফের উদয়ের সঙ্গে। প্রতাপ রায়ের পুত্র আদিত্য তখন বাঁচিয়া। আদিত্যের উদার হৃদয় ও বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া প্রতাপরায়ের সুখস্বপ্ন সেদিন কেবলমাত্র জমাট হইয়া আসিতেছিল। এমনই সময়ে সর্ব্বনাশের কালোমেঘ ঘনাইয়া আসিল। মহাল হইতে ফিরিবার পথে অন্ধকার রাত্রে গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইলেন। শোনা গিয়াছিল ছোট তরফের চক্রান্ত ইহার মধ্যে রহিয়াছে। প্রভুভক্ত প্রজাদের কেহ কেহ বলিয়াছিল উদয় স্বয়ং নাকি সেখানে ছিল। তথাপি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছোট তরফের কোনও শাস্তিই হয় নাই। বিচারে যেদিন ছোট তরফ খালাস পাইল সেইদিন হইতে প্রতাপ রায় বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আদায়পত্র ইত্যাদি বলাই-ই করিত। বিশাল জমিদার গৃহে একজন অস্তমুখী বৃদ্ধ ও একটি নবজীবনশোভনা বালিকার দিন কাটিতেছিল। ছোটতরফ এখন সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের শীর্ষে উঠিয়াছিল—তাহাদের নিত্য নব নব আনন্দ উল্লাসের কাহিনী মাঝে মাঝে বলাইয়ের মারফৎ

আসিয়া পৌঁছিত। বৃদ্ধ ও রত্না সমান ঔদাসিন্যে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন। সব দিক দিয়া পরাজিত হইলেও একটি দিকে বৃদ্ধ প্রতাপ রায় আজিও ছোটতরফের উপরে মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সে তাঁহার আভিজাত্য বোধ। আভিজাত্যে, বংশগরিমায় রায়বংশের তুলনা মিলে না। আর ছোট তরফ মাত্র কয়েক পুরুষ ও পূর্ব্বেও নাকি নৌকা বাহিত—এমনই একটা প্রবাদ আছে। তারপর—কি সূত্রে কাহার নিকট হইতে অর্থ পাইয়া ধীরে ধীরে জমিদারীর অংশ ক্রয় করিতে সুরু করে। এদিকে রায়বংশের অচলা লক্ষ্মী তখন চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছোট তরফের গলায় বরমাল্য দান করিলেন। ছোট তরফ জাঁকিয়া উঠিল, টাকায় সবই হইল কিন্তু বংশ গরিমা পাওয়া গেল না। সেদিক দিয়া রায়বংশ তাহাদের নাগালের বাহিরে। ছোট তরফের বহু অর্থ ব্যয়েও তাহা মিলে নাই।

আদিত্যের মৃত্যুর বহুদিন পরে আবার সেই ছোটতরফের নাম রায়বাড়ীতে শোনা গেল। পুরাতন স্মৃতিতে বৃদ্ধ প্রতাপ রায়ের সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। ইহা যে কোনও অপমান, কোনও নূতন ষড়যন্ত্রের সূচনা নয় কে বলিবে! রত্নার কালো চোখে বিদ্যুৎ জ্বলিতেছিল। উদয় আসিয়াছে—তাহার পিতার প্রত্যক্ষ হত্যাকারী উদয়। পিতাকে তাহার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেই প্রসন্ন হাসিভরা মুখ কতদিন সে দেখে নাই।

কতদিন তাঁহার মধুমাখা 'মা' ডাক শুনে নাই। আর শুনিবে না—আর সেই উদার ললাট প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী পিতাকে সে দেখিতে পাইবে না। রত্নার চোখের বিদ্যুৎ নিভিয়া গিয়াছে—চোখ দুটিতে দহের কালো জলের জোয়ার। দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল আপন ঘরে আত্মসম্বরণ করিবার জন্য। নাতিনীর গতি পথের পানে চাহিয়া প্রতাপরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাহার পর বলাইকে ডাকিয়া কহিলেন—ছোটবাবুকে নিয়ে এস। বলাইয়ের পিছনে যে লোকটি আসিয়া রায়মশাইয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ। চাপা ওষ্ঠে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার একটা অব্যক্ত ছায়া ভাসিতেছে। হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন উদয় চৌধুরীকে। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রায় মহাশয় তাহার দিকে তাকাইলেন। পরে বলাইকে কহিলেন—ওরে একটা আসন দে। বলাই পাশের ঘর হইতে একখানা মখমল মোড়া কেদারা লইয়া আসিল। ছোটবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বিনীত ভাবে রায় মহাশয়ের কুশল প্রশ্ন করিলেন। রায়ের ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। উদয় আসিয়াছে তাঁহার কুশল প্রশ্ন করিতে। ভালো—হ্যাঁ ভালোই আছেন তিনি—চমৎকার আছেন। কিন্তু উদয়ের আসল প্রশ্নটা কি তাহাই জানিতে চান রায়মহাশয়। অবশেষে উদয় তাঁর বক্তব্য বলেন—তাঁর জ্যেষ্ঠ

পুত্র শঙ্কর দীর্ঘকাল পরে দেশে আসিয়াছে। রূপে গুণে তাহার তুলনা মিলে না। ঐ একটি মাত্র পুত্রই তাঁহার। ভণিতা শুনিয়া রায়মহাশয়ের চোখ দুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, ব্যাপারটা বেশ সরল হইয়া উঠিতেছে—না? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সে প্রস্তাব কি কেহ তুলিতে পারে?

ছোটবাবু বলিলেন—শঙ্করের সহিত তিনি রত্নার বিবাহ দিতে চান।

রায়মহাশয়ের বুকের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে বাজ ডাকিয়া উঠিল—চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, শুষ্ক কম্পিত ওষ্ঠাধর বার কয়েক কাঁপিল। চিৎকার করিয়া কহিতে গেলেন—'না'। কিন্তু সহসা আর্ত্তস্বরে উচ্চারিত হইল—আদিত্য! পুত্রহত্যার দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে পুত্রের নাম উচ্চারিত হইল পিতার মুখে। পরক্ষণেই তিনি লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন অতিরিক্ত উত্তেজনায়। মৃদু অলঙ্কার শিঞ্জনের সঙ্গে দ্রুত আসিয়া প্রবেশ করিল রত্না। পিতামহের লুণ্ঠিত মস্তক সযত্নে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে লইতে মুখ তুলিয়া ছোটবাবুর পানে চাহিল। দহের অতলস্পর্শী গভীরতা তার চোখে। সে চোখে এখন জ্বলিতেছে বিদ্যুৎ। কহিল—আপনি আসুন এখন। ছোটবাবু স্তব্ধ হইয়া এতক্ষণ রত্নাকে দেখিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন অভিজাত রূপরাশি বুঝি ইহাকেই বলে। সার্থক হইবে ইহাকে বধূরূপে লাভ করা।

এখন রত্নার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন। উঠিতে উঠিতে বলিলেন—হ্যাঁ এখন উঠি মা—তোমার দাদু সুস্থ হলে আবার আসব।

রত্নার বঙ্কিম ওষ্ঠাধরে তাচ্ছিল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কহিল—না, আপনাকে আর আসতে হবে না। দাদু উত্তর দিতে চেয়েছিলেন।—'না'। আমিও আপনাকে তাই জানিয়ে দিচ্ছি। অনর্থক এই অসম্মানকর প্রস্তাব নিয়ে এসে আমাদের অসম্মানিত ক'রবেন না।

বেত্রাহতের মত ছোটবাবু চলিয়া গেলেন। রত্না হাসিল, তাহার বিবাহ ঐ পিতৃহন্তার পুত্রের সঙ্গে! পরক্ষণেই দহের জলে বান ডাকিল। রত্না তাহার দাদুর বুকের'পরে পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপরাহ্ণ নামিয়া আসিয়াছে—দহের বাঁধলা ঘাটের 'পরে বসিয়া রত্না ভাবিতেছে দুদিন আগের ঘটনার কথা। আজ ছোটবাবু সংবাদ পাঠাইয়াছেন রত্নাকে পুত্রবধূরূপে তাঁহার চাই। নতুবা রায়মহাশয়কে এবার পৈত্রিক বাস উঠাইতে হইবে তাহারই ব্যবস্থা তিনি করিতেছেন। প্রতাপ রায় সেদিনের অসুস্থতার পর এখনও উঠিতে পারেন নাই—সেজন্য এ সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। বিষণ্ণমুখে রত্না তাহাই ভাবিতেছিল। সাতদিন সময় সে পাইয়াছে।

সহসা পিছন হইতে ছায়া পড়িল দহের জলে। রত্না ফিরিয়া চাহিল তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে সঞ্জীব। রত্নার বিষণ্ণমুখে হাসি দেখা দিল। কহিল—তোমাকেই ভাবছি, এস, কদিন কোথায় ছিলে?

সঞ্জীব তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল—ছিলাম না এখানে। কিন্তু, রত্না তোমার নাকি বিয়ে?

রত্না দহের দিকে চাহিয়াছিল, কহিল তাই তো শুনছি!

কার সঙ্গে রত্না?

শোননি? ছোট তরফের শঙ্করের সঙ্গে? দিব্যি ছেলে—চমৎকার চেহারা। অনেক টাকা!

রত্নার মুখের পানে চাহিয়া সঞ্জীবের মুখ ম্লান হইল—কহিল বেশ ভাল কথাই তো!

সহসা সবেগে সঞ্জীবের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া রত্না কহিল—বিয়ে করবো ঐ ছোট তরফের ছেলেকে? যার বাবা আমার বাবাকে কাপুরুষের মত অন্ধকার রাত্রে হত্যা করেছিল। তার আগে ঐ দহের জলে আশ্রয় নেব একথা নিশ্চয় জেনো সঞ্জীব।

সঞ্জয় সাশ্চর্য্যে কহিল তার মানে?

রত্না কহিল—সমস্ত পরগণার লোকে জানে একথা—তুমি জান না কিছু?

সঞ্জয় কহিল—তোমাকে তো বলেছি রত্না—আমি এদেশের ছেলে হলেও আমার সমস্ত জীবনটাই কেটেছে বিদেশে। ছেলে বয়সেই মামার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মা নেই। কাজেই দিদিমার কাছেই মানুষ হয়েছি। তাই দেশের সঙ্গে বাস্তব পরিচয় আমার একটুও নেই।

রত্না চুপ করিয়া শুনিতেছিল। দহের জলে তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে। আকাশে মেঘ জমিতেছে—দহের কালো জল ফুলিতেছে। তাহার উন্মত্ত কলরোলের মাঝে রত্না ধীরে ধীরে তাহার পিতৃহত্যার নিদারুণ কাহিনী বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া সঞ্জীব যখন মুখ তুলিল তখন বেদনায় তার মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছে। সহসা রত্নার হাত দুইটি ধরিয়া গভীর স্বরে কহিল—রত্না! বিশ্বাস কর আমি তোমায় ভালবাসি।

রত্নার চোখে দহের জল—কহিল, তা আমি জানি সঞ্জীব। শঙ্করকে যে আমি বিয়ে করতে পারি না তা কি তুমি এখনও বোঝ নি?

আর্ত্তস্বরে সঞ্জীব কহিল—বুঝেছি বলেই তো এত বেদনা আমার।

বিদ্যুতের মত একটা কথা রত্নার মনে জাগিল।

শঙ্কিতভাবে সে কহিল—তুমি? তুমি? কে তুমি সঞ্জীব?

আমি শঙ্কর।

প্রচণ্ডবেগে বাজ পড়িল। আর সেইসঙ্গে নামিল অজস্র বর্ষার ধারা। দহের জলে অবিশ্রাম কোলাহল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বিশ্বসংসার স্তব্ধতার মাঝে ঢাকা পড়িয়াছে। বর্ষার ধারা থামিয়াছে। আকাশে জ্যোৎস্নার আভাস। দহের জলেও সেই আলো চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। দুরন্ত কালোজলের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে একটি রমণী মূর্ত্তি। অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারা যায় না। নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাশি দহের বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে রায়রায়ান প্রতাপ রায়ের অতি আদরিণী পৌত্রী রত্না। মাত্র কয়েকঘণ্টায় তাহার চোখে বিশ্বের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। আপন হাতে রচিত প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে। ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে ফুলের প্রাসাদ। অশ্রুহীন চোখে রত্না দেখিতেছে সেই আগুনের লেলিহান শিখা! বিপদের পরে বিপদ বাড়িয়াছে। অসুস্থ প্রতাপ রায়ের কাণে ছোট তরফের হুকুম কেমন করিয়া পৌঁছিয়াছে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তিনি আবার জ্ঞান হারাইয়াছেন। এখন জ্ঞান ফিরিয়াছে কিন্তু অবস্থা আশাপ্রদ নহে। পুত্রহীন পিতা বোধ হয় এইবার পুত্রের কাছে যাত্রা করিবেন। রত্নার শক্তি নাই সে যাত্রা হইতে পিতামহকে ফিরাইয়া আনে। আশ্রয়হীনা সর্ব্বহারা রত্নার কী হইবে? দহের জলে প্রচণ্ড মাতন জাগিয়াছে। তার প্রচণ্ড কলরোল ও

অপূর্ব্ব নৃত্যের তালে তালে জীর্ণ প্রাসাদের ভিত্তি বারংবার কাঁপিতেছে। কি সে করিবে? কে তাহাকে পথ দেখাইবে? শঙ্করের কথা সে ভাবিতে পারিতেছিল না। তার স্নেহময় পিতার উষ্ণ রক্তস্রোত তাহাদের মধ্যে প্রবহমাণ। সে স্রোতের পাড়ে সুখের ঘর কি বাঁধা যায়? সে স্রোতের উন্মত্ততা কি এই দহের অপেক্ষাও অধিক নয়? সহসা রত্না চমকাইয়া উঠিল। ভিতর হইতে ত্রস্তকণ্ঠে বলাই বারংবার তাহাকে ডাকিতেছে। দ্রুতপদে রত্না উঠিয়া গেল।

সাতদিন অতিবাহিত হইয়াছে। রায় পরিবারে আসিয়াছে প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন। বৃদ্ধ প্রতাপ রায়ের জীর্ণ শোকার্ত্ত আত্মা পার্থিব সকল মান অপমানের দায় এড়াইয়াছে।

দহের পাশে বসিয়া বসিয়া রত্না সেই কথাই ভাবিতেছিল। মাত্র সাতটি দিন। ইহারই মধ্যে মানুষের জীবনে এত পরিবর্ত্তন আসিতে পারে? পিতামহের কথা মনে করিয়া তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সমস্ত জীবন ভরিয়া কি দুঃসহ বেদনাই না তিনি বহন করিয়া গেলেন। এতটুকুও শান্তি তাঁহার জন্য ভগবান অবশিষ্ট রাখেন নাই। সর্ব্বশেষে এই নিদারুণ অপমানকর বিবাহপ্রস্তাব। দাদু চলিয়া গিয়া ভালই করিয়াছেন। রত্নাও যদি যাইতে পারিত অমনই করিয়া। ছোটতরফ আজ আবার সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন রত্নার দাদুর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ

করিয়া এবং রত্নাকে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া। রত্না তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে 'না' জানাইয়া দিয়াছে। অপমানিত জমিদার বলিয়া পাঠাইয়াছেন আগামী পূর্ণিমার রাতে বিবাহ সজ্জা যেন প্রস্তুত থাকে। জমিদার স্বয়ং আসিবেন পুত্রের বিবাহ দিতে। রত্নার ওষ্ঠে হাসি খেলিয়া গেল—অবশেষে শঙ্করও যোগ দিয়াছে এই ষড়যন্ত্রে! না দিবেই বা কেন? উহারই পুত্র তো। রক্তের ধারায় প্রবাহিত অত্যাচার ও অবিচার। ভালই হইয়াছে, শঙ্করকে ভোলা তাহার পক্ষে সহজ হইবে। আকাশে দুই একটি তারা ফুটিয়াছে। ওপাশে কোথায় কেয়ার ঝোপ—বাতাস তাহার সুগন্ধে আমন্থর, দহের জলে কোন অশ্রুত স্বপ্নলোকের মর্ম্মর ধ্বনি। রত্না চোখ বুজিল। সহসা কানের পাশে পরিচিত কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল। রত্না চোখ চাহিল—দেখিল শঙ্কর ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছে তাহার পাশে। মুহূর্ত্তে রত্নার কালো চোখে বিদ্যুৎ জাগিল—কহিল: শঙ্করবাবু পূর্ণিমার এখনও দেরী আছে।

বিষাদখিন্ন কণ্ঠে শঙ্কর কহিল—আমাকে ভুল বুঝো না রত্না, বাড়ীতে আমি অসম্মতি জানিয়েছি এ বিয়েতে। বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ত্যাগ করবেন বলেছেন।

রত্না স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল—চোখ তুলিয়া চাহিল মাত্র।

শঙ্কর কহিল—আমি তাতে দুঃখিত নই রত্না—কিন্তু তোমাকে বাঁচাতে পারব না। বাবা তাঁর ভাইপোর সঙ্গে

তোমার বিয়ে দেবেন। রত্না হাসিল। শঙ্কর তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিল—সহসা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—রত্না, কিছুতেই কি আমাদের বিয়ে হতে পারে না?

স্থিরভাবে দহের জলের পানে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে রত্না কহিল—'না'!

বেদনায় শঙ্করের মুখ কালো হইয়া গেল। কহিল, না? বেশ। কিন্তু আমি কি কোরবো রত্না? বলে দিতে পার?

রত্না পূর্ণদৃষ্টিতে শঙ্করের পানে চাহিল—দহের ওপাশে তখন চাঁদ উঠিতেছে। দৃঢ়সঙ্কল্পে পূর্ণ সে মুখ—কহিল কি করতে চাও?

বাঁচতে চাই না রত্না।

রত্নার মুখে জ্যোৎস্নার আলো—অপূর্ব্ব মমতা ভরা সে মুখ। কহিল—মরতে পারবে শঙ্কর?

তাহার চোখের পানে চাহিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত শঙ্কর কহিল—পারবো রত্না।

ভেবে দেখো।

দেখেছি।

তবে পূর্ণিমার গোধুলিলগ্নে হবে আমাদের মৃত্যুবাসর। সেদিন এস—সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে এস শঙ্কর। আমাদের

সেদিন শুভ বিবাহ। রত্না হাসিয়া উঠিল। কোমল কণ্ঠের হাসির রেশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া দহের জলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দহের জলের তরঙ্গে তরঙ্গে-জাগিল তাহার প্রতিধ্বনি।

আজ পূর্ণিমা। জমিদার উদয় চৌধুরীর তীব্র জেদ ভাঙ্গে নাই। তিনি তাঁহায় ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিবেন রত্নার। রত্না অবশেষে সম্মত হইয়া সংবাদ পাঠাইয়াছে তাঁহার কাছে। জমিদার আত্মহারা হইয়া সমগ্র জমিদারীর সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন। গোধুলি লগ্নে যাত্রা সুরু হইল। শঙ্করের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

রত্না বিবাহের সাজে সাজিয়াছে। সাঁচ্চা জরীর কাজ করা বেনারসী তাহার দেহে, পিতামহীর জড়োয়া সিঁথি, কঙ্কণ, কেয়ূর বাজুর হীরক তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে। মাথায় হীরার মুকুট পরিয়া রাণীর মত সে দাঁড়াইয়াছিল দহের পাশে। একটু পরেই সেখানে আসিল শঙ্কর। দেখা গেল মৃত্যুবাসরের জন্য শঙ্করও আয়োজন কম করে নাই। গরদের ধুতির সঙ্গে গরদের পাঞ্জাবী। পায়ে জরীর কাজ করা নাগরাই। গলায় দুলিতেছে সুন্দর বকুলমালা। রত্নার পানে চাহিয়া শঙ্কর হাসিল। কহিল—কি দেখছ?

দেখছি তোমাকে। শঙ্কর তুমি ফিরে যাও, মৃত্যু তোমার জন্য নয়। জীবন তোমার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে।

ম্লান হাসি হাসিয়া শঙ্কর কহিল—তোমার যে পথ রত্না আমারও তাই। ফেরার উপায় নেই।

কালো চোখ তুলিয়া রত্না কহিল—তবে এসো।

দহের পাড় ঘেঁসিয়া উঠিয়াছে সুবিশাল অট্টালিকা। আজ তাহারই কক্ষে কক্ষে জ্বলিতেছে আলোকমালা। বহুদিন পরিত্যক্ত কক্ষগুলি পুষ্পমালা ও দেবদারু পাতায় সাজিয়াছে। বহুদিন পরে রায়প্রাসাদে বেলোয়ারী আলোর ঝাড়গুলিতে রঙিন আলোর উৎসব লাগিয়াছে। বলাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব কাজ করিতেছে আর থাকিয়া থাকিয়া অলক্ষ্যে আপনার চোখ দুটি মুছিতেছে। বাহিরে আজ বাজিয়াছে বর্ষার প্রচণ্ড ডম্বরু। দহের জলে বান ডাকিয়াছে। কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে দহ দুরন্ত যৌবনাবেগে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া জীর্ণ প্রাসাদের ভিত্তিমূল থর থর করিয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছে। রত্নার পিছনে শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল প্রাসাদে। এই প্রথম এই প্রাসাদে প্রবেশ করিল শঙ্কর। আগে আগে বলাই পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। কক্ষের পর কক্ষ পার হইয়া অবশেষে একটি সিঁড়ির মুখে আসিল তাহারা। বলাই আলো দেখাইল—সিঁড়ি বাহিয়া পাতাল কক্ষে নামিয়া আসিল রত্না শঙ্করকে লইয়া। ছোট একখানি লৌহনির্ম্মিত কক্ষ। বলাইয়ের হাতের আলোয় অন্ধকারের মাঝেও শঙ্কর দেখিল গৃহে একটি মাত্র লৌহদ্বার।

আর কিছু নাই কোথাও। কিন্তু বিস্মিত হইয়া সে অনুভব করিল কক্ষখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। লৌহ দুয়ারের ওপারে তুমুল গর্জ্জন। শঙ্কিত হইয়া শঙ্কর কহিল—কিসের শব্দ রত্না ?

রত্না হাসিয়া কহিল—দহের স্রোত ওপাশে।

বলাই ইতিমধ্যে উঠিয়া গিয়াছিল। আবার এখন নামিয়া আসিল—কহিল দিদি বরযাত্রীরা সব এসে গেছেন।

রত্না ব্যস্ত হইয়া কহিল—এসে গেছেন ? বলাই দা—ওঁদের ওপরের সাজানো ঘরে বসাও, যত্ন কর। ত্রুটি না হয়।

বলাই উঠিয়া গেল।

শঙ্কর কহিল—কিছু বুঝতে পারছি না রত্না। মৃত্যু যদি আমাদের অভিপ্রেত এখানে এলাম কেন ? বিবাহ যদি না হবে তবে ওঁদের বসাতে বল্লে কেন রত্না ?

বিচিত্র হাসি হাসিয়া রত্না কহিল—এই তো আমাদের মৃত্যুবাসর শঙ্কর। আর ওঁরা হবেন সে বাসরে সম্মানিত অতিথি !

বলাই আবার আসিল। আর্দ্রস্বরে কহিল—ঠাকুর মশাই বল্লেন—লগ্ন উপস্থিত দিদি।

আনন্দের হাসি হাসিয়া রত্না কহিল—লগ্ন এসেছে বলাই দা ? এস তবে এবারে তোমার কাজ কর। শঙ্কর আমার পাশে এস।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শঙ্কর তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বলাই তখন প্রচণ্ড শক্তিতে সেই লৌহ কবাটের অর্গল মোচন করিতেছে। শঙ্কর কহিল—রত্না! বুঝেছি এতক্ষণে, আমাদের মৃত্যুবাসরের স্বরূপ কি? তাতে ক্ষোভ নেই আমার। কিন্তু এতো শুধু তোমার আমার নয়—এ যে সকলের মৃত্যু সমাধি! উপরে রয়েছেন আমার বাবা, আমার আত্মীয়বন্ধু তাঁদের কেন এভাবে মৃত্যু হবে অনর্থক?

'অনর্থক। রত্না তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—শঙ্কর, ভুলো না তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহা আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। তাই আজ এই অভিনব আয়োজন, ব্রত উদ্‌যাপনের পরমক্ষণ এসেছে আজ। এস শঙ্কর আজ আমাদের বিবাহ।

রুদ্ধ ক্ষোভ ও রোষে শঙ্কর কহিল—ছেড়ে দাও আমাকে। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না রত্না—কিন্তু আমার অসহায় বাবা?

রত্নার সুতীক্ষ্ণ হাসি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল পাতালকক্ষে। কহিল—সময় নেই শঙ্কর। উপায় নেই, আজ আমার বিজয়ের দিন—রায়বংশের তর্পণ আজ।

বলাইয়ের সুদৃঢ় বাহুর সবল টানে লৌহ কবাট মুক্ত হইয়া গেল। পরক্ষণেই খল খল হাস্যে দহের জল ঢুকিল পাতাল গৃহে। রত্না অবিশ্রাম হাসিতে লাগিল। তারপর শঙ্করের

হাত ধরিয়া সুমিষ্টস্বরে কহিল—ভয় কি শঙ্কর। এস আমরা মৃত্যু সাগর অতিক্রম করে অমৃতের সন্ধানে যাই—ভয় কি ?

শঙ্করের গলার বকুল মালাটি আপন হস্তে জড়াইয়া লইয়া রত্না স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল দহের দ্রুত প্রবেশ। বাহিরে প্রকৃতি ধ্বংসের রূপে সাজিয়াছে। বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে বাহিরে—বিদ্যুৎ খেলিতেছে রত্নার কালো চোখে।

ঘর জলে ভরিয়া গেল। আর্ত্তভাবে শ্বাস টানিয়া শঙ্কর ডাকিল—রত্না !

রত্না কহিল—ভয় কি শঙ্কর ?

অভয়বাণী শুনিয়া শঙ্করের বিবর্ণ ওষ্ঠাধারে হতাশার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

জল বাড়িতে বাড়িতে ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রাসাদের এই অংশটি বার কয়েক ভূমিকম্পের মত দুলিল। পরক্ষণেই সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। প্রকৃতির কোথাও বিপর্য্যয়ের চিহ্নমাত্র নাই। জ্যোৎস্নার জড়োয়া গহনায় সজ্জিত হইয়া দহ প্রতীক্ষা করিতেছে কাহার ? দহের জলে ভাসিতেছে একগাছি বকুলমালা।

দেব-দেউল

"ভাঙ্গা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব
কত পূজা নিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত ক'ব তা,
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা।"

জঙ্গলের মাঝে বিশাল দেউল। ভগ্ন পাষাণের ফাটলে জন্মেছে সুবৃহৎ বটগাছ। তার পত্রছায়ে মন্দির আত্মগোপন করেছে লোক চক্ষুর অন্তরালে। ক্বচিৎ হয়তো কখনও কোনও পথচারী পথিকের বিস্মিত দৃষ্টি এসে পড়ে সেই গম্ভীর প্রাচীন দেউলের পরে। দু'দণ্ডের জন্য চেয়ে দেখে—আবার আপন

গন্তব্য পথে যায় চলে। মন্দিরের বিগ্রহ কবে কোনদিন ভক্ত পূজারীর অবহেলায় মন্দির ত্যাগ করে গেছেন চলে—দেবপীঠ তাই শূন্য।

প্রতিদিন আমার চোখের সম্মুখে দেখি বনজলতাগুল্মে আবৃত সেই বিশাল মন্দিরের সুউচ্চ শিখর। সূর্য্যের প্রথম আলো অতি প্রত্যুষে আজও তার পরে এসে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। মন্দিরের অদৃশ্য বিগ্রহের উদ্দেশে দিনের প্রথম পূজা এই ভাবেই হয় নিবেদিত।

এই প্রাচীন মন্দির যতবারই আমার চোখে পড়ে ততবারই মনে হয় একি পরিহাস নিয়তির ? পূজার্চ্চনা বর্জ্জিত এই মন্দির—আজ এর সমারোহ ভার কিছু নেই—কিন্তু চিরদিনইতো—এমন ছিলনা। একদা ভক্ত প্রাণের একাগ্র সাধনায় নির্ম্মিত হয়েছিল এই মন্দির—তারপর কোন পুণ্যক্ষণে ঈপ্সিত বিগ্রহ হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত পরম উৎসবের মাঝে। প্রতিদিন প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় মন্দির মুখরিত করতো কত পূজা আরতি, কত সমারোহ ভার, কত মঙ্গলাচরণ ! তারপর মানুষের ওঠা—পড়ার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে একদিন মন্দিরে বিরল হল ভক্ত পূজারীর সংখ্যা—ক্রমে এল আরতির দীপ ম্লান হয়ে—মঙ্গল শঙ্খধ্বনি থেমে গেল। বিগ্রহ লুপ্ত হয়ে গেল অবহেলা ও অনাদরের উদাসীনতায়। অবশেষে প্রকৃতি বাহু বাড়িয়ে তাকে

টেনে নিল আপন বুকের মাঝে। তার শ্যামল অঞ্চলের তলে আত্মগোপন করল মন্দির।

মনে হয় দিবস রজনীর সেই বিচিত্র কাহিনী কি আজও এর পাষাণগাত্রে চিহ্নিত নেই! কত যুগের কত অলিখিত কাহিনী—মানুষে মানুষে কত সংঘাতের ইতিহাস গ্রথিত হয়ে আছে এর সঙ্গে! সে কথা কি এই ভগ্ন দেউলের বিরহী আত্মা প্রতিক্ষণেই প্রকাশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে নেই!

সেদিন সন্ধ্যার পর মন্দিরের পাশ দিয়ে ফিরছি। মন্দিরের ভিতরে দৃষ্টি পড়তেই থেমে গেলাম, দেখলাম একটি কিশোরী একখানি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে মন্দিরের বিগ্রহপীঠের পাশে রেখে দিয়ে আপন অঞ্চল কণ্ঠে জড়িয়ে নত হয়ে প্রণাম করল—সেই বিগ্রহহীন পাষাণ বেদীর উপরে সদ্য গ্রথিত একছড়া আকন্দ পুষ্প-মাল্য। সে মন্দির হতে বেড়িয়ে আসতেই আমি বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম—এখানে কার জন্য প্রদীপ দিতে এসেছ তুমি? এ কার মন্দির! বালিকা মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল—দেবতাকে প্রদীপ দিতে আসি, এ মন্দির মহাকালের। রহস্যের সুরে বল্লাম—কিন্তু দেবতা কই!

উদ্ধত গর্ব্বে সে জবাব দিল—অবিশ্বাসী তাকে দেখতে পায়না। তার পরেই দ্রুতপদে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রদীপের ম্লান আলোয় শূন্য মন্দির অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

এর পর হতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি দেখতাম সেই শ্যামলা কিশোরী একখানি প্রদীপের আলোয় শূন্য মন্দিরকে আলোকিত করে যায়। আর বেদীর পরে রেখে যায় একছড়া আকন্দমালা। আমি নিঃশব্দে প্রতি সন্ধ্যায় সেই মন্দিরের পাষাণ সোপানে বসে থাকতাম। দেখতাম নির্জ্জন পরিত্যক্ত দেবদেউলে পাহাড়ী সাঁওতালী বালিকার সন্ধ্যারতি। ক্রমে তার সঙ্গে আমার আলাপ জমে উঠল। সরলা সংসার অনভিজ্ঞা বালিকার গল্প শুনতে শুনতে আমার সমস্ত মন ভরে উঠত। নির্জ্জন বনবীথির অন্তরালে শূন্য দেবদেউলপ্রাঙ্গণে এক কিশোরীর ঝঙ্কৃত কলকণ্ঠে সান্ধ্য গান পূর্ণ হয়ে উঠত।

গম্ভীর উদাসীন মন্দির হয়তো আমাদের এই অসমবয়সী সখ্যতায় আপন অসীম শূন্যতা ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হত। আমার প্রশ্নের উত্তরে কিশোরী বলেছিল—এই শূন্য দেউলে সন্ধ্যা প্রদীপ ও মালা দেওয়া তাদের কুলব্রত। বংশ পরম্পরায় তাদের বাড়ীর মেয়েরা এই কাজ করে এসেছে। এ মন্দির নাকি তাদেরই একান্ত নিজস্ব। তাদের বংশের কোন এক তরুণী আপন বক্ষ শোণিতে এ মন্দিরে আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। এই অপূর্ব্ব রহস্যময় কাহিনী শুনবার এক প্রবল আগ্রহ মনে জেগে উঠল। এক সন্ধ্যায় দেব দেউলের সন্ধ্যারতির পরে সেই কিশোরীর কাছে শুনলাম এই দেউলের অতীত

ইতিহাস। কুলমন্ত্রের মত এ কাহিনী ওদের পরিবারের সকলের কণ্ঠস্থ। মুখে মুখে চলিত হয়ে এসেছে।

বহুদিন অতীত কোন এক বিস্মৃত দিবসে পুণ্যশ্লোকা রাজ-রাণীর মনে জেগেছিল মহাকাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার বাসনা। শিল্পনিপুণ কিরাত জাতি ছিল দেশের দেবদেউল নির্ম্মাণে সিদ্ধ হস্ত। মহারাণীর আদেশে তারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছিল এক সুবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের চূড়ায় মহাকালের স্বর্ণ ত্রিশূল হল স্থাপিত। মহা সমারোহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব হল। রাজ্য জুড়ে সেদিন উৎসব নিমন্ত্রণ। কিন্তু সে উৎসবে অন্ত্যজ—কিরাত জাতির কোনও অংশই ছিল না সেদিন। তারা একমাত্র মন্দির গড়ার মজুরী পেয়েই খুসী মনে ফিরে গিয়েছিল আপন আবাসে। এরই মাঝে ঘটল এক দুর্দ্দৈব, আরতির পুণ্যক্ষণে পঞ্চপ্রদীপ পুরোহিতের হাত হতে স্খলিত হয়ে পড়ল ভূমিতে—প্রদীপের ঘৃতে সিক্ত হল স্বর্ণ থালায় মহারাণীর নিজহস্তে রচিত নৈবেদ্য। অশুভ সূচনায় মহারাণীর অন্তর ক্লিষ্ট হয়ে উঠল, ক্রমে মন্দির শূন্য হয়ে গেল। উৎসব অবসানে সকলে বিদায় নিল। কেবল মহারাণী বসে রইলেন বিগ্রহের পানে তাকিয়ে। সারারাত অতিবাহিত হল এইভাবে। পরদিন প্রভাতে মহারাণী ঘোষণা করলেন মহাকালের আদেশ—অন্ত্যজ কিরাত জাতির পূজা নিবেদিত হবে মন্দিরে সর্ব্বাগ্রে—নতুবা অপরের পূজা

কোনওদিনই বিগ্রহ গ্রহণ করবেন না। সেদিন এক সুপ্রভাতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে পতিত জাতির সম্মিলিত পূজায় দেবদেউল মুখরিত হয়ে উঠেছিল। আর মহারাণীর অন্তর ভরে উঠেছিল পরম তৃপ্তিতে।

সেদিনের পর বহুদিন কেটে গেছে। কালক্রমে মানুষ ভুলেছে সেই অতীত দিনের গৌরবকে। ছোট জাতকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। পতিত জাতি দূরে সরে গেছে আপন অন্তরের বেদনা নিয়ে। সকলেই ভুলেছে যে এ মন্দিরে একদিন ব্রাহ্মণের চেয়ে অব্রাহ্মণের পূজা দেবার অধিকারই প্রশস্ত ছিল। সেদিনের অধিকার আজকের দিনে একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ত্যজ জাতির অধিনায়ক কিরাত সর্দ্দার এখনও মন্দিরের পূজা দেবার অধিকার পেয়ে থাকে। তবে সে পূজার আয়োজন হয় তাদের অশুচি স্পর্শ বাঁচিয়ে। ব্রাহ্মণ এসে রচনা করে সে পূজার নৈবেদ্য—তারাই বহন করে নিয়ে যায় সে পূজার অর্ঘ্যথালি মন্দিরে। আজও এই পূজাই নিবেদিত হয় বিগ্রহের সম্মুখে—সবার আগে।

নতুন রাজা এ প্রথা ঠিকমত অনুমোদন করে উঠতে পারেন না। মন্দিরে কিরাতের পূজা দেবতা ব্রাহ্মণের পরে একটা প্রচণ্ড অপমানের মতই তিনি মনে করেন। কিন্তু সহসা এই প্রাচীন প্রথাকে লোপ করা সমীচীন কিনা সে বিষয়ে

তাঁর মনে একটা দ্বিধার ভাব ছিল। এমনি একদিনের কাহিনী—

সেদিন শিব চতুর্দ্দশী। মহাকালের মন্দিরে উৎসব স্থরু হয়েছে। মধ্যাহ্নে রাজবাড়ী হতে এল পূজা উপচার, সঙ্গে এসেছেন রাজকন্যা নিজে। এই প্রথম তাঁর মন্দিরে আগমন! কুমারী সারাদিন উপবাসী থেকে ব্রত পালন করেছেন। পূজার উপচারে কোথাও ত্রুটি নেই। নানা পুষ্প সম্ভারে পুষ্প পাত্র স্থশোভিত তবুও রাজকন্যার মুখচ্ছবি প্রসন্ন নয়—মনের ক্ষোভের পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর মুখের পরে। কুমারীর অন্তরের কামনা ছিল আপন হস্তে একগাছি আকন্দের মালা স্থচারু-রূপে গেঁথে মহাকালের গলায় পরিয়ে দেবেন। রাজউদ্যানে আকন্দ গাছে ফুল ফোটেনি বিশেষ করে আজকের দিনেই।

পূজাসম্ভার বিগ্রহের সম্মুখে সাজানো। রাজকন্যা তার পাশে বসে আছেন। পুরোহিত ত্রস্তভাবে উপচার গুছিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু এখনও পূজা আরম্ভ হতে দেরী আছে। কারণ কিরাত সর্দ্দারের গৃহ হতে এখনও পূজা এসে পৌঁছয়নি মন্দিরে। উৎকণ্ঠিত হয়ে মন্দিরের দরজায় তিনি দৃষ্টিপাত করছেন বারবার।

সহসা মন্দির প্রাঙ্গণে সম্মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে চারিদিক সচকিত হয়ে উঠল। রাজকন্যা তাঁর উৎস্থক দৃষ্টি মন্দিরের

দরজায় প্রেরণ করলেন। দেখলেন মন্দিরের বাইরে অসংখ্য কিরাত সৈন্যের সমাবেশ। তাদের দেহে উৎসব সজ্জা, সেই জনতার ভীড় হতে মন্দিরে এসে প্রবেশ করল একটি তরুণী, সুললিত তার দেহসৌষ্ঠব, নয়নে সুন্দর একটি আত্মসমাহিত ভক্তি আর্দ্র দৃষ্টি। দেহ বর্ণ গৌর নয়, শ্যামল। সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে আভিজাত্যের একটি সহজ ও সংযতপ্রকাশ। গৈরিক পট্টবস্ত্রে তার শ্যামলবর্ণ সুষমাময় হয়ে উঠেছে। বিগ্রহের সম্মুখে সে নতজানু হয়ে প্রণাম করল—দীর্ঘ কেশপাশে তার নতমুখ আবৃত হয়ে গেল। তরুণীর পশ্চাতে এল পূজা উপচার। পুরোহিতের দক্ষিণে রাজকন্যার পূজা আয়োজন—বামে কিরাত কন্যার পূজা সম্ভার। দুইই বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় ও মহামূল্যবান। রাজকন্যা বিস্মিত হয়ে তরুণীর দিকে তাকালেন—কে এই সুন্দরী উপাসিকা? কোন ঐশ্বর্য্যবানের কন্যা? তরুণী তখন উঠে বসেছে। পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে তরুণী বল্ল—ঠাকুরমশাই! এই সুন্দর আকন্দের মালা আমি আপন হাতে গেঁথেছি, দেবতার গলায় এ মালা দেবার অধিকার নেই। আপনি পবিত্র গঙ্গাজলে ধুয়ে ওঁকে পরিয়ে দিন। পুরোহিত তরুণীর হাত হতে মালাটি নিয়ে জল ছিটিয়ে সে মালা বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিতে দিতে বল্লেন—এ ফুল তুমি কোথায় পেলে মা? আজ এফুল কোথাও

পাওয়া যায়নি। রাজকন্যার বাগানেও ফোটেনি আজ আকন্দ।

সন্ত্রমভরা দৃষ্টিতে একবার রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে তরুণী দৃষ্টি নত করে নিল। বল্ল—পিতা লোক দিয়ে পর্ব্বতের উপর হতে প্রচুর ভাবে এই ফুল সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন আমাকে। আমি জানতাম না রাজকুমারীর এ ফুল প্রয়োজন ছিল—তা' হলে অবশ্যই আমি এ ফুলের অংশ তাঁকে পাঠিয়ে দিতাম।

অবরুদ্ধ রোষে ও ক্ষোভে রাজকন্যার অন্তর ভরে উঠেছিল—তিক্ত কণ্ঠে তিনি বল্লেন, ভিক্ষার ফুলে রাজকন্যার পূজা হয় না। সে হীন বৃত্তি আমার নেই—কিন্তু ঠাকুর মশাই আপনি আর কত দেরী করবেন? এতক্ষণে আমার পূজা শেষ হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল নাকি?

অপ্রতিভ স্বরে পুরোহিত বল্লেন—এই এখনি আরম্ভ করি মা। কিরাতের পূজা আনতে আজ বিলম্ব হয়েছে সে জন্যই বিলম্ব হ'ল। বিস্মিত কণ্ঠে রাজকন্যা প্রশ্ন করলেন—কিন্তু কিরাতের পূজার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

পুরোহিত প্রশান্ত কণ্ঠে বল্লেন—অনার্য্যের পূজা এ মন্দিরে আগে নিবেদিত হবে এই যে সনাতন বিধি মা। কথা সমাপ্তির সঙ্গেই পুরোহিতের ইঙ্গিতে মহাকালের দেউলে সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে পূজা আরম্ভ হল।

ক্রোধ ও অপমানে রাজকন্যার গৌর আনন রক্তিম হয়ে উঠল। কতক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করে আছেন তাঁর পূজা সম্ভার নিয়ে—কিন্তু সবই হল ব্যর্থ। মহাকালের প্রিয় পুষ্প সংগ্রহ করেছে ঐ দুর্বিনীতা পিতৃগর্ব্বে গর্ব্বিতা তরুণী। যে অন্ত্যজ কিরাত জাতি বংশ পরম্পরায় তাঁদের একান্ত অনুগত ভৃত্য তারই প্রেরিত পূজা আগে গ্রহণ করবেন মহাকাল। চারিদিক হতে রাজকন্যার একি শোচনীয় পরাজয়? ধনুকের ছিন্ন ছিলার মত তীব্রবেগে রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালেন। বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠে বল্লেন —ঠাকুর মশাই কিরাতের পূজাতেই আজ মহাকাল তৃপ্ত হ'ন। আমার পূজা আমি ফিরিয়ে নিলাম। বিদ্যুতের মত চকিতে রাজকন্যা মন্দির ত্যাগ করে, কিংখাবে মোড়া পাল্কিতে উঠে বসলেন। চোখে তখন তাঁর অপমানের অশ্রুর প্লাবন।

রাজকন্যার তীব্র বাণীতে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে ভুল হয়ে গেল। আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ধ্যানরত সেই তরুণীর মুখে কোনও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। রাজকন্যার ভৎসর্না তাঁর কানেই হয়তো প্রবেশ করেনি।

পূজা শেষ হ'ল তখন অপরাহ্ন। তরুণী দেবপ্রণতির পরে পুরোহিতের চরণ বন্দনা করে দক্ষিণা দিল আপন বাম হস্তের অনামিকার রক্তাঙ্গুরীয়। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতীক্ষমান কিরাতজনতাকে নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ বিতরণের পর সে মন্দির হতে বিদায় নিল।

পূজা শেষে তরুণী নগর প্রান্তে কিরাত প্রাসাদে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করল, গৃহে তখন বিপর্যয় কাণ্ড ঘটেছে, রাজকন্যাকে অপমানিত করার অপরাধে বৃদ্ধ কিরাত সর্দ্দারের ডাক পড়েছিল রাজ দরবারে। উপবাসী সর্দ্দার চলে গেছে সেইখানে এখনও সে প্রত্যাবর্ত্তন করেনি। ক্ষোভে ও গ্লানিতে তরুণীর অন্তর ভরে উঠল—আহা! বৃদ্ধ পিতা! কত অপমান তাঁর শুভ্রকেশে বর্ষিত হয়েছে সারাদিনে, কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? কী তাদের অপরাধ? তরুণীর মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া ভেসে উঠল।

কিছু পরে দেখা গেল বলিষ্ঠ অশ্ব পৃষ্ঠে সুগঠিত দেহা এক কিরাত তরুণী সৈনিকের বেশে চলেছে রাজপুরীর দিকে। পৃষ্ঠে তার শরাসন—হাতে সুদীর্ঘ বল্লম—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আলো প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে তার পরে। রাজপুরীতে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে তরুণী ছত্রভঙ্গ জনতার কাছ হতে শুনল—তীব্র অপমানের পর কিরাত সর্দ্দারকে সামান্য পত্রবাহকের কার্য্যে পদব্রজে প্রেরণ করা হয়েছে রাজ্যান্তরে রাজকুমারীর ভাবী পতিগৃহে। উপবাসী সর্দ্দার আপন বিশ্বস্ততার মর্য্যাদা রাখতে নির্ব্বিবাদে চলে গেছে সেই হীন কার্য্যের ভার নিয়ে। উত্তেজিত কিরাতদের সে বলে গেছে শান্ত হতে। মহাকালের মন্দিরে কবে কোন কিরাতসর্দ্দার রাজবংশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চির বিশ্বস্ততার—তারই ঋণশোধ সমগ্র কিরাত জাতিকে করতে হবে

চিরদিন এইভাবে। গভীর মর্ম্মবেদনার ছায়া ফুটে উঠল সেই অশ্বারোহিণীর মুখে। তীব্র কশাঘাতে অশ্ব ছুটে চলে গেল মহাকালের মন্দিরে।

শিব চতুর্দ্দশীর রাত্রি, মহাকালের আরতি সুরু হয়েছে। রাজকন্যা এসেছেন রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে। সেই উদ্ধতা তরুণী এ বেলা আসেনি। রাজকন্যার অহঙ্কৃত অন্তর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। কেবলমাত্র পুরোহিত আপন অন্তরে একখানি ভক্তি-আর্দ্র কোমল মুখের অভাব অনুভব করছিলেন।

প্রাঙ্গণে আলো অন্ধকারে সেই অশ্বারোহিণীর মূর্ত্তি এসে দাঁড়ালো। দূর হতে মাথা নত করে বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে অস্ফুটস্বরে সে বল্ল—দেবতা তুমি কি সত্যই প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ অথবা কেবলেই পাষাণ? কে দেবে তার উত্তর! নির্বিবকার বিগ্রহ শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কেবলমাত্র আকন্দ ফুলের মালায় জাগল ঈষৎ দোলা।

গভীর রাত্রে সহসা নিদ্রিত নগরবাসী জেগে উঠল ভীষণ কোলাহলে। উৎসবক্লান্ত সদ্যনিদ্রা জাগরিত নরনারী শুনল পার্ব্বত্য দস্যুদল আক্রমণ করেছে নগর। গুপ্তচর মুখে তারা জেনেছে আজ কিরাত সর্দ্দারের অনুপস্থিতির সংবাদ—কিরাত সৈন্যদের ক্ষোভের কথা—আর জেনেছে উৎসবক্লান্ত নগররক্ষীদের

ছত্রভঙ্গ ব্যবস্থা। এ সুযোগ তারা অবহেলা করেনি। গভীর নিশীথে আক্রমণ করেছে নগর।

ছত্রভঙ্গ বিপর্য্যস্ত সৈন্যদল কোথাও তাদের বাধা দিতে পারল না। দস্যুদল মহাকাল মন্দিরের দিকে ধাবিত হল। পুরুষানুক্রমে রাজ্যের মূল্যবান সম্পদ এখানেই ছিল সুরক্ষিত। কোথায় মন্দির রক্ষী প্রহরীদল! মন্দিরে তখনও পূজা চলেছে, রাজকন্যা ও অন্যান্য রাজপুরনারীরা সেখানেই আছেন। মন্দিরের ঘণ্টা রুদ্রস্বরে বারবার আহ্বান জানাতে লাগল প্রহরীদের—কিন্তু কোথায় কে? পুরোহিত মন্দিরের সুবৃহৎ লৌহ কবাটে অর্গল রুদ্ধ করে দিলেন।

দস্যুদল দুর্দ্দমনীয় গতিতে এগিয়ে এল মন্দিরের দিকে। প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছুবামাত্রই মন্দিরের অলিন্দ হতে এক ঝাঁক বিষাক্ত তীর এসে প্রথম দলের বক্ষ ভেদ করল। শিব চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকার, কতজন প্রহরী প্রহরায় আছে অনুমান করা কঠিন। তাদের হাতে নেই তীরধনুক। দূর হতে বল্লম ও অসির সাহায্যে কিছু করা সম্ভবপর নয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই আসছে অজস্র বিষাক্ত তীর—দস্যুদল পিছু হটতে সুরু করল। এই অবসরে এল দস্যুদলের পিছন হতে কিরাত সৈন্যের একটা ক্ষুদ্র দল। দুই দিক হতে এইভাবে বাধা পেয়ে দস্যুদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পলায়নের সময়ে ক্রুদ্ধ ও বিফলকাম দস্যু দলপতি

আপন বিষাক্ত বল্লম নিক্ষেপ করল সেই অদৃশ্য শর সন্ধানীর প্রতি।

দস্যুদল পলায়িত। নিরাপত্তার সঙ্কেত পেয়ে পুরোহিত মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করলেন। বাইরে অগণিত জনতা। প্রাঙ্গণে শায়িত এক সৈনিকের দেহ। বক্ষে তার বিদ্ধ দীর্ঘ বল্লম। উষ্ণ রক্তে প্রাঙ্গণ সিক্ত হয়ে উঠেছে। মন্দির রক্ষাকারী এই অসীম সাহসী বীরের পরিচয় কি জানবার জন্য তার মস্তক হতে উষ্ণীষ খুলে নেওয়া হল। জনতা বিস্মিত হয়ে দেখল উষ্ণীষের নীচে সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশভার। কে এই তরুণী! সকলেই চাইল তার মুখের দিকে। পরক্ষণেই সমগ্র কিরাতদের কণ্ঠ হতে আকুল আর্ত্তনাদ উচ্চারিত হ'ল—সর্দ্দার কুমারী! সর্দ্দার কুমারী!

পুরোহিতের ইঙ্গিতে কুমারীর দেহকে জনতা বহন করে নিয়ে এল মন্দিরে—স্থাপিত করল তাকে দেব বিগ্রহের পদতলে। পুরোহিতের কম্পিত কণ্ঠ শোনা গেল—

তোমার পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তোমার জাতির যে অধিকারের অবমাননা ঘটেছিল দিনে দিনে—আপন বুকের শোণিতে তাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছ তুমি! এ মন্দিরে কিরাত জাতির শাশ্বত অধিকার।

ভীতি বিহ্বলা রাজকুমারী একবার তরুণীর মুখের দিকে

চাইলেন সে মুখে আত্মঅধিকারের মর্য্যাদাবোধ সুপরিস্ফুট পরক্ষণেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল বিগ্রহের দিকে, দেবতার গলায় আকন্দের মালা—পুষ্পের প্রতিটি দল বিকশিত হয়ে উঠেছে।
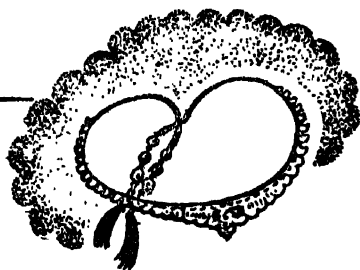
কণ্ঠহার

যুদ্ধের বাজারে আগুন লাগিয়াছে—সে আগুনে পুড়িতেছে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবার সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ভাবে। খাদ্যে, বস্ত্রে, ঔষধে কোথাও এতটুকু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন—সামান্য আয়ে সংসার তরণীর ভার সামঞ্জস্য আর রাখিতে পারিতেছি না। উন্মত্ত ঝোড়ো হাওয়ায় জীর্ণ তরণী দোল খাইতেছে—নীচের গভীর ঘূর্ণাবর্ত্ত কেবলই টানিতেছে তাহাকে তাহার অকূল তলে। আর অবারিত আকাশের রৌদ্র ও বৃষ্টি সমানভাবে আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। শুনিতেছি পশ্চিম সমুদ্রের ঝড় থামিয়াছে—কিন্তু বাংলার খাল বিলের তরঙ্গ এখনও থামে নাই—কবে থামিবে ভগবান জানেন।

একমাত্র ছেলেটির টাইফয়েড। আজ উনত্রিশ দিন চলিতেছে। ডাক্তার ডাকা অনেকদিনই বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ঔষধ পথ্য যোগাড় করিতে পারি নাই। যুদ্ধের বাজারে ডাক্তারখানায় দুষ্প্রাপ্য ঔষধ মিলে না—

যাহা মিলে তাহা কালো বাজারে। সেই কালোবাজারের পূর্ণ মর্য্যাদা দিবার মত শক্তি আমার নাই। গত তিনদিন যাবৎ আমাদের রান্না বন্ধ আছে। ঠিক যে খোকার অসুখের উদ্বেগেই এমনটা হইয়াছে তাহা নয়—ঘরে এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করা চলে। পয়সা নাই কিছু কিনিয়া আনিবার মত। পিপাসা লাগিলে কলসী হইতে শীতল জল গড়াইয়া খাইতেছি। ধন্যবাদ কর্পোরেশনকে! এখনও জল খাওয়াটা চলিতেছে। তবে এ সুখ আর কতক্ষণ? বাড়ীওয়ালা মহাশয় সকাল হইতে দুইবার তাড়া দিয়া গিয়াছেন—মুমূর্ষু ছেলেটার জন্য কিছু করিতে পারিতেছেন না। তবে ভাবভঙ্গীতে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিতেছেন যে বাড়ীতে একটা মৃত্যু ঘটে এমনটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই আমরা সময় থাকিতে থাকিতে যদি উঠিয়া অন্যত্র যাই তবে তিনি বিশেষ বাধিত হইবেন— এমন কি বাকী মাসের ভাড়ার জন্যও বিন্দুমাত্রও তাগাদা করিবেন না। বাড়ীওয়ালা অত্যন্ত ভদ্রলোক একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাহাতে তো সমস্যার সমাধান ঘটিতেছে না। আমি এখন কি করি। ছেলেটার বাঁচিবার আশা করি না—কাল হইতে জ্ঞান নাই। কিন্তু শেষ নিশ্বাস পড়িলে পর উহার সৎকার করিবার মত পয়সাটাও নাই তাহাই ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্রের শয্যার পার্শ্বে তাহার

জননী বিনিদ্রনয়নে বসিয়া আছে। ঔষধ পথ্যের অভাবে যদি কেবলমাত্র মাতৃস্নেহের অজস্রতা দ্বারা সন্তানকে রোগমুক্ত করা যাইত তবে অনেক সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হয় না। আমি গতকল্য হইতে ওঘরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি—যাইতে পারিতেছি না গভীর মর্ম্মবেদনায়—নিজের অক্ষম পিতৃত্বের গ্লানিতে। চুপ করিয়া এ ঘরে বসিয়া আছি শেষ সংবাদ জানিবার জন্য।

সহসা বাহির দ্বারে করাঘাতের সঙ্গে বাড়ীওয়ালার কণ্ঠস্বর জাগিল। দ্বার খোলাই ছিল, ভদ্রলোক ত্রস্তপদে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন—কি মশাই যাওয়ার কতদূর কি করিলেন, আমি অন্য ভাড়াটিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি। কলিকাতার বাড়ী এখন আর পড়িয়া থাকে না। সত্যই পড়িয়া থাকে না, ভদ্রলোকেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছি। কিন্তু ঠিক এখনই কিছু করিবার মত উপায় আমার কিছুই তো নাই। তাই নিরুত্তরে মাথা নত করিয়াই রহিলাম। ভদ্রলোক আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না—চিৎকার করিয়া কহিলেন—কি বিপদেই পড়িয়াছি—আপনাদের বাড়া ভাড়া দিয়া। বাড়ীতে একটা মৃত্যু না ঘটাইয়া কি আপনারা কিছুতেই ছাড়িবেন না? সহসা এক চাপা আর্ত্তনাদে চমকিয়া চোখ ফিরাইলাম—দেখিলাম ও ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আমার পত্নী। দুই চোখে ব্যাকুলতার

সীমা নাই। রুক্ষ কেশরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে—আয়ত নেত্রে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতেছে। বাড়ীওয়ালার শেষ কথাটা সে শুনিতে পাইয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইল। উঠিয়া তাহার কাছে গেলাম—আমি কিছু বলিবার আগেই সে আমার দক্ষিণহস্তে তাহার মুষ্ঠি হইতে কি একটা দিয়া কহিল—কতবার আর বলিতে হইবে যে এই সামান্য জিনিষটি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া যা হোক একটা উপায় কর। আমার অলঙ্কারের কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি এখনই উহার প্রাপ্য মিটাইয়া দাও। তাহার কণ্ঠস্বর অব্যক্ত ক্রন্দনে রুদ্ধ হইয়া গেল। দ্রুতপদে সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। পিছন পানে চাহিয়া দেখিলাম বাড়ীওয়ালা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই রণে ভঙ্গ দিয়াছেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, হাতের পদার্থটি টেবিলের পরে রাখিলাম—অতি পরিচিত জিনিষ কিন্তু মুল্যহীন। দরিদ্রের ঘরে ভূষণপ্রিয়া ঘরণী হইলে এ প্রবঞ্চনা ছাড়া উপায় নাই। তাই কতদিন আগে রোল্ডগোল্ডের এই হার ছড়াটি উহাকে আনিয়া দিয়াছিলাম—সঙ্গে একখানি সুদৃশ্য সাদাপাথর। দরিদ্রা অনভিজ্ঞা নারী তাহাকেই খাঁটি ভাবিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিল। বহুদিন সে অতি যত্নে ব্যবহার করিয়াছে। আমার ভয় ছিল কবে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রবঞ্চনা ধরাইয়া দিবে, কিন্তু

সেই দায় হইতে ভগবান রক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক ব্যবহারেও উহা বিবর্ণ হয় নাই। কিছুদিন যাবৎ আর এটা স্ত্রীকে ব্যবহার করিতে দেখি নাই—ভাবিয়াছিলাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভয়ে ভয়ে একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলাম, সে কহিয়াছিল—অভাবের যে তাড়না চারিদিকে, সর্ব্বদাই ত বিক্রয় করিবার প্রলোভন জাগে। তাই খুলিয়া রাখিয়াছি, ভাবিব কিছুই নাই। একবার গেলে আর হইবে না! অন্তরের ব্যর্থতাকে চাপা দিবার জন্য সেদিন মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলাম।

আজ কয়েকদিন যাবৎই পত্নী সেই চেন ছড়াটি বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে—আমি নানা অজুহাতে এড়াইতেছি। পত্নী কি ভাবিতেছে জানি না, সেই মুল্যহীন অলঙ্কারখানির পানে চাহিয়া নিজের জীবনকে বড় অপদার্থ বোধ হইল, রুদ্ধ হতাশ বেদনার যে কী গ্লানি কেমন করিয়া বুঝাইব? ঘরের ওপাশে একখানি ক্ষুদ্র কোঠা—তাহারই মধ্যে কখন স্ত্রীর ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন জানি না! চাহিয়া দেখিলাম বিশ্বের পরে ভরসা হারাইয়া উপায়হীনা নারী সেই পাথরের মূর্ত্তির পায়ে মাথা খুঁড়িতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার রুদ্ধ বেদনার অস্ফুটধ্বনি কানে আসিয়া বাজিতেছে। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি, মনে মনে ভাবিতেছি—ঠাকুর! পাষাণ দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পাষাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছ—কিন্তু

মানুষের মনে এত মমতা দিয়াছিলে কেন? শুনিতেছি নিরুপায়া জননীর আর্ত্তনাদ ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে—অন্তরের শেষ ব্যাকুল আবেদন, ফিরাইয়া দাও আমার সর্ব্বস্বকে—চোখ বুঁজিয়া শুনিতেছি, ভাবিতেছি কখন শেষ হইবে এই সকরুণ আর্ত্তনাদ—সহসা চমকিয়া উঠিলাম—খিল খিল খিল খিল—অপরূপ ছন্দে কে হাসে? এই মুমূর্ষু রোগীর শেষ তন্দ্রাকে আহত করিয়া ওই ব্যাকুলা জননীর আর্ত্তকণ্ঠকে ব্যঙ্গ করিয়া কে এমন হাসে। আমার দেহের শিরায় শিরায় স্পন্দন জাগিতেছে কেন? কোন অতীতকালের সুখদুঃখ আশা নিরাশার সুর কাঁপিতেছে ওই পাগল করা হাসির তরঙ্গে? চোখ মেলিয়া চাহিলাম—আমার চারিপাশের আবেষ্টনী দূরে সরিয়া যাইতেছে কেন? কোথায় আমার পুত্রের শয্যাকক্ষ—আমার স্ত্রীর ঠাকুর ঘর? কোথায় রাখিয়া আসিলাম খোকাকে? অন্ধকার নামিতেছে কেন চোখের সম্মুখে? আমি কি ঘুমাইয়া পড়িতেছি?

২

খিল খিল খিল খিল—বীণার তারে তারে ঝঙ্কার উঠিতেছে যেন। সহস্র বাতির রোশনাইয়ে প্রাসাদ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রশস্ত নাটমণ্ডপতলে পাখোয়াজ, মন্দিরা, তানপুরার

সুরে সুরে ইন্দ্রজাল। অগণ্য দর্শক বসিয়া আছে। বেশভূষা দেহসৌষ্ঠবে তাহাদের আভিজাত্য প্রকাশমান—আর তাহারই মধ্যে বসিয়া আছি আমি। অপূর্ব্ব ঢংয়ের রাজকীয় পরিচ্ছদ। মণির মালা জ্বলিতেছে কণ্ঠে—মাণিক্যের অঙ্গদ বাহুতে—কর্ণে হীরককুণ্ডল—চরণযুগলের মুক্তাখচিত পাদুকা একপাশে অবহেলিত—উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী আমি। সভার মধ্যস্থলে অপরূপা এক তরুণী নর্ত্তকী—সেই নর্ত্তকীই হাসিতেছে। আমারই ছুঁড়িয়া দেওয়া হীরকনূপুর নৃত্যরতা রূপসীর পায়ে গিয়া চমৎকারভাবে আত্মদান করিয়াছে তাহার দুখানি রক্তরাঙা কোমল ক্ষুদ্র চরণ ঘিরিয়া। উপহার দিবার সেই অনন্যসাধারণ কৌশলের কৌতুকে রূপসী হাসিতেছে। খিল খিল খিল খিল—হাসির কোমল মীড়ের ঝঙ্কারে বেলোয়ারি সহস্রদান বাতিতে কম্পন জাগিয়াছে। আলো কাঁপিতেছে রূপসীর সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া—তাহার কুঞ্চিত কেশদামে, শুভ্র মৃণাল গ্রীবায়, ক্ষুদ্র ললাটে, রক্ত ওষ্ঠাধরে, তাহার বক্ষহারের মণিতে, কেয়ূরের হীরকে, পায়ের হীরক মঞ্জীরে আলো কাঁপিতেছে—আলোছায়ার মাঝে ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া সে হাসিতেছে—হাসিতেছে আমারই পানে চাহিয়া। দীর্ঘ বঙ্কিম কৃষ্ণকালো আঁখির তারায় দুখানি নীলকান্তমণি—তাহার বিদ্যুৎ সকল মণিমাণিক্যকে হার মানাইয়াছে। সুগৌর তনু বেষ্টিয়া

নীলাম্বরী মুক্তাখচিত পেশোয়াজ—বক্ষে মূল্যবান কাঁচুলী—ক্ষুদ্র সুগঠিত মস্তকখানির একপাশ আবৃত করিয়া মাটিতে লুটাইতেছে স্বর্ণখচিত ওড়না—দীর্ঘ নিবিড়কৃষ্ণ কুন্তলরাশি মণিখচিত হইয়া বিষম ভুজঙ্গের মত খেলিতেছে তাহার হাসির তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে। হাসিতে হাসিতে ক্রমে সে ভাঙ্গিয়া পড়িল—চারিদিক অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে—প্রচ্ছন্ন আলো অন্ধকারে ঝরিতেছে বকুল আর কেতকীপুষ্পের দল—কোন সুরসিকা পরিচারিকা পিচকারী করিয়া আতর আর গোলাপজলে সিক্ত করিয়া দিল আমার মূল্যবান মসলিমের পরিচ্ছদ—কিসের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া গেল আমার দুই চোখ। আলো নিভিয়া গিয়াছে—নর্ত্তকী তখনও হাসিতেছে—খিল খিল খিল খিল।

উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠা নটী মালতীবকুল। তাহার অসামান্যরূপে নগরীর সর্ব্বত্র সাড়া ফেলিয়াছে। তাহার উপরে সে সঙ্গীত ও নৃত্যে নিপুণা। কোথা হইতে আসিয়া সহসা একদিন নগরীর বুকে উল্কার মত আবির্ভূতা হইল জানি না—তবে তাহার সে আবির্ভাবে পূর্ণিমা-সমুদ্রের মত সমগ্র নগরীর বুকে স্পন্দন জাগিল। বীরশ্রেষ্ঠ সামন্ত, ধনকুবের শ্রেষ্ঠী সকলের বীর্য্য ও সম্পদ তাহার কোমল নৃত্যপরা-চরণপ্রান্তে আত্মনিবেদন করিয়া সার্থকতায় জাগিয়া উঠিল। মালতীবকুল অকৃপণভাবে তাহার দাক্ষিণ্য বিতরণ করিতে লাগিল প্রসন্ন স্মিতহাস্যে। যাহারা

তাহার সেই প্রসন্নহাস্যে ধন্য হইল আমি তাদের মধ্যে একজন। আমার পূর্ব্বপুরুষদের অগাধ ঐশ্বর্য্য বন্যার জলের মত সবেগে ব্যয় হইতে লাগিল তাহার কৃপা কটাক্ষের অনুগ্রহের জন্য। ক্রমে আমার মোহ প্রবল ঈর্ষারূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মালতীবকুলের গৃহে অন্য কাহারও উপস্থিতি আমি সহিতে পারিতাম না, অবশেষে আমার বিপুল অর্থভাণ্ডার তাহার হস্তে সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া দিয়া তাহার গৃহে অপরের উপস্থিত হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

এমনইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। গৃহের সহিত সকল সম্পর্কই শেষ করিয়া দিয়াছি। গৃহে আমার সুন্দরী পত্নী আর একমাত্র পুত্র ছিল। তাহাদের এককালে বড় ভালবাসিতাম। যখন মালতীবকুলকে দেখি নাই—তখন ভাবিতাম এমন গুণবতী রূপসী ভার্য্যা পাওয়া বড় সৌভাগ্যের কথা, ভাবিতাম এমন কান্তিমান প্রিয়দর্শন বুদ্ধিমান বালক পুত্র কাহারও নাই। তাহাদের এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব দেখিলে বেদনার সীমা থাকিত না। ভাবিতাম সমগ্র বিশ্বের ভূষণ আহরণ করিয়া অনিয়া আমার পত্নী যৌবনশ্রীকে সাজাইতে পারিলে মনের বাসনা তৃপ্ত হইত। আমার বাড়াবাড়ি দেখিয়া শ্রী হাসিত, লক্ষ্মীর মাধুর্য্যে গড়া তাহার সেই হাসি দেখিতে বড় ভাল লাগিত। আমার সেই সপ্তম বর্ষীয় বালকপুত্রকে আমি

নিজে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতাম, তাহার সহিত মল্লক্রীড়া করিতাম, তাহার সহিত আমার উদ্যানের স্বচ্ছ দীঘি-বক্ষে সন্তরণ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতাম।

কিন্তু সে অতীতের কথা। আর অতীত অর্থ মৃত। আমার বর্ত্তমান ঘিরিয়া কেবলমাত্র মালতীবকুলই জাগিতেছে। গৃহের কথা মনে করিবার সময় নাই—আর সত্য কথা বলিতে কি একদা পরম সুখকর সেই গৃহের আবেষ্টনী আজ দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। তাহাদের চিন্তায় বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করি। তাই আমার পত্নীপুত্রের কথা আর ভাবিনা—কি ভাবে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছে তাহার খোঁজ লইবার আবশ্যকতা অনুভব করি না। আমাদের দেওয়ানকে বলিয়া দিয়াছিলাম যত অর্থ প্রয়োজন হইবে তিনি যেন সংবাদ পাওয়া-মাত্র আমাকে পাঠাইয়া দেন মালতীবকুলের গৃহে। পিতৃ পিতা-মহের আমলের শুক্লকেশ সেই দেওয়ান আমাকে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহার সেই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিয়াছি। তাহার পর হইতে মালতীবকুলের নিযুক্ত এক ব্যক্তিই আমার দেওয়ানের কাজ করিতেছে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই। সুচারু-রূপে সমস্ত কাজই চলিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম এবং মালতীবকুলের তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা করিতাম। মালতীবকুল

তাহার নিজস্ব অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাসিত। তাহার সেই হাসির মধ্যেই সকল প্রশ্নের জবাব মিলিত। দেখিতাম তাহার মত আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী আর কেহ নাই এ সংসারে। কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন নত হইয়া পড়িত তাহার কাছে।

দিন কাটিতেছিল। অতীতকে ভুলিয়াছি। কিন্তু তথাপি কখনও যদি রাজসভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সহসা দেখিতাম কোনও প্রিয়দর্শন দুরন্ত বালক রাজপথের ধূলা মাখিয়া ছুটিয়া যাইতেছে সমগ্র মনটা কোন এক অনির্দ্দিষ্ট কারণে তাহার পানে বাহু প্রসারণ করিয়া ছুটিয়া যাইত। তাহার মুক্তাপাঁতির মত শুভ্র দশন শিখরেঁর বিদ্যুৎচমকের মত হাসির রেখাটি আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিত। মালতীবকুল পাশে থাকিলেও অন্যমনস্ক হইয়া যাইতাম। রাজপথে চলিবার সময়ে কাহার দর্শন আশায় চোখ দুইটি উন্মুখ হইয়া উঠিত—নিজের কাছেও তাহা পরিস্কার ভাবে জানিতে চাহিবার সাহস ছিল না। কিন্তু সে উন্মনাভাব ক্ষণ মাত্রের। সঙ্গীতে নৃত্যে অভিনয়ে এবং সর্ব্বোপরি তাহার অম্লান রূপের লাবণ্যে মালতীবকুল আমাকে অন্য এক জগতে লইয়া যাইত। আমি সকল দুঃখ ভুলিতাম—পৃথিবীর কাহাকেও আর মনে পড়িত না—কেবল মাত্র মালতীবকুলের উজ্জ্বল মুখখানি জাগিত আমার নয়ন পটে। আমার পূর্ব্বপুরুষের কষ্টার্জ্জিত অমূল্য মাণিক্যরাজি ভূষণরূপে তাহার সর্ব্বাঙ্গে শোভা

পাইত—আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতাম আর ভাবিতাম রত্নগুলি এতদিনে সার্থক হইয়াছে। অনর্থক ভাণ্ডারে পড়িয়া থাকিয়া কেবলই ভার বাড়াইতেছিল।

দিন কাটিতেছিল—সম্মুখে বসন্তোৎসব। বিলাস সজ্জায় উজ্জয়িনী নগরী অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রঙিন বস্ত্রে, মাল্যে শোভিত নরনারীর প্রাণে প্রাণে রঙের দোলা। পুষ্পিত পলাশ কিংশুক আর অশোকের ডালে ডালে বসন্ত রাণীর বিজয় পতাকা দুলিতেছে। ফুলবনে আজ মধু উৎসব। সন্ধ্যায় সেখানে উৎসবপ্রিয় নরনারীর সম্মিলন। আমিই কেবলমাত্র স্তব্ধ হইয়া আছি মালতীবকুলের উদ্যানের একপাশে। মনে বড় অশান্তি জাগিয়াছে। সংবাদ পাইয়াছি আমার পূর্ব্বপুরুষের ঐশ্বর্য্য, যাহা রাজভাণ্ডারের সঙ্গে সগর্ব্বে প্রতিযোগিতা করিতে পারিত—তাহা নিঃশেষিতপ্রায়। আমার পিতার পরম অহঙ্কারের অমূল্য মণিরাজি আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। কিন্তু দুঃখ সেজন্য নহে। দুঃখ এবং আশঙ্কা মালতীবকুলকে লইয়া। তাহাকে একমাত্র আমার ঐশ্বর্য্যে বাঁধিয়াছিলাম—আজ সে সম্বল ফুরাইলে কি দিয়া তাহাকে আর ভুলাইব। কিছুতেই সমস্যার সমাধান হইতেছিল না। তরুণী পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল—আমার উৎসবসজ্জা প্রস্তুত। আমি উঠিলাম, ভবিষ্যতের ভাবনা এখন ভাবিয়া কি করিব আর। আমার নিজের প্রকোষ্ঠে

প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার মালতীবকুলের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম তাহার বসন্ত-সজ্জা সমাপ্ত হইয়াছে। দেখিলাম অসম্বৃত বিপুল কবরীভার এলাইয়া গম্ভীর মুখে বাতায়নপথে আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে সে—মূল্যবান প্রসাধন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর কিছু। তথাপি ঐ অপূর্ব্ব-রূপসীর গাম্ভীর্য্য বুকে বেদনা জাগাইল। ধীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া কহিলাম—কি হইয়াছে মালতী ?

উদাস নয়ন আকাশের দিক হইতে আমার পানে ফিরাইয়া কহিল—কিছুই নহে।

তাহার পার্শ্বে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলাম—কহিলাম বসন্ত-সজ্জা কর নাই যে।

সে কহিল—মধু উৎসবে যাইব না।

এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! শ্রেষ্ঠা রূপসী—মধু-উৎসবে না যাইলে আজ সমগ্র নগরীর উৎসব মাটি হইবে যে। কহিলাম—সে কী—? এমন কথা...

একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে সহসা কহিল—একদা যেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া গিয়াছিলাম—সেখানে আজ ভিখারিণী সাজিয়া যাইতে পারিব না।

ভিখারিণী সাজিয়া! তাহার অর্থ! রাজনটী মালতী-বকুলের সাজিবার বসন ভূষণ নাই! হতভম্ব হইয়া মালতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সে আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝিল—কহিল, বসন্ত-সজ্জার উপযোগী নব অলঙ্কার কোথায়! এ সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে। বহুবার পরিয়াছি, গত বৎসর মধু উৎসবে তুমি আমাকে কবরীভূষণ হইতে চরণের মঞ্জীর পর্য্যন্ত নূতন অলঙ্কার দিয়াছিলে। আর এ বৎসর একখানাও নূতন ভূষণ দাও নাই। তাই স্থির করিয়াছি এ দীনতা অপরের কাছে দেখাইব না।

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায়রে! নব অলঙ্কারের অভাবে আজ মালতিবকুল বসন্ত সজ্জা করিতে পারিতেছে না। আর হতভাগ্য আমি—তাহার প্রতিকার খুঁজিয়া পাইতেছি না। পিতৃপুরুষের পরে ক্রোধ হইল, আরও অর্থ তাঁহারা কেন রাখিয়া যান নাই। ধরণীর সকল ভূষণই যাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিবার যোগ্য সেই আজ প্রসাধনহীনা! তবু করুণ-স্বরে কহিলাম, মালতী! আমার সবই তোমার পদপ্রান্তে আনিয়া দিয়াছি—আজ আমার মণিভাণ্ডার শূন্য। মালতীবকুল চোখ তুলিয়া আমার পানে চাহিল, কৃষ্ণ নয়নে বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। বঙ্কিম ওষ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গ হাস্য। কহিল, মিথ্যাভাষী তুমি! তোমার মণিভাণ্ডারের যাহা কিছু উদ্বৃত্ত তাহাই আমাকে দিয়াছ, শ্রেষ্ঠ

সম্পদগুলি অন্যত্র গিয়াছে। কহিলাম, সে কি কথা! এমনটা তোমার কিসে মনে হইল? আমার মণিভাণ্ডারের সামান্যতম অংশও আর কোথাও যায় নাই। সকলই তোমাকে দিয়াছি।

সে কহিল—আমি জানি কোথায় গিয়াছে।

কহিলাম, কোথায়?

মালতীবকুল কহিল—শ্রেষ্ঠী পত্নী যৌবনশ্রীর মণিমঞ্জুষার ভিতরে।

চমকিয়া উঠিলাম—এ কাহার নাম সে উচ্চারণ করিল? পূর্ব্বজন্মের কোন সুখস্মৃতি জড়িত নাম? কিন্তু কর্ণে যেন তপ্ত লৌহ শলাকা কেহ প্রবিষ্ট করাইয়া দিল।

কুহকিনী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাসিতেছিল। কহিল—শুনিয়াছি তোমার পিতা তাঁহার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন গাঁথিয়া তাঁহার আদরিণী পুত্রবধুকে সাজাইয়াছিলেন। তেমন অলঙ্কার আর কাহারও নাই এ দেশে। আজ মধু উৎসবে সে সেই ভূষণে সাজিয়া যাইবে সংবাদ পাইয়াছি—আমি সেইখানে ভিখারিণী সাজিয়া যাইতে পারিব না।

অপূর্ব্ব মানুষের মন! দীর্ঘদিন যৌবনশ্রীর কোনও সংবাদ রাখি নাই—সে কেমন ভাবে দিন কাটাইতেছে জানিতাম না। কোনও আকর্ষণ তাহার জন্য হৃদয়ে অনুভব করি নাই। কিন্তু আজ যে মুহূর্ত্তে জানিলাম সে সুসজ্জিত হইয়া মধু উৎসবে

যাইবে—তখনই মনের মধ্যে এক অদ্ভুত বিকার জাগিল। মনে হইল দীর্ঘদিন যাহার স্বামী খোঁজ লয় না—আজিকার মধু উৎসবে যাহার লজ্জায় মুখ লুকাইয়া থাকা উচিত, সে আপনাকে প্রকাশ করিতে চায় কোন স্পর্দ্ধায়? মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। মালতীবকুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আমার সেই ভাব-বিপর্য্যয় দেখিতেছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম—কহিলাম, না তাহা হইবে না। স্বেচ্ছাচারিণীর এ স্পর্দ্ধা সহিব না—ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিব।

অবিশ্বাসের স্বরে রূপসী কহিল—কি করিবে?

অনেকদিন পরে আহত পৌরুষ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, কোন জবাব না দিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

* * * *

মালতীবকুলকে লইয়া মধু উৎসবে আসিয়াছি। তাহার মুখে আত্মতৃপ্তির জয়গৌরবের হাসি খেলিতেছে। আর সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া জ্বলিতেছে অমূল্য রত্নরাজি যাহা একদিন শ্রেষ্ঠ-ক্ষপণকের আদরিণী পুত্রবধূ যৌবনশ্রীর সুললিত অঙ্গে শোভা পাইত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত এই মণিরাজি খচিত অলঙ্কার পরিয়া যৌবনশ্রী কখনও বাহিরে আসে নাই, সে কখনও মধু উৎসবে যোগদান করিত না। তাহার স্বাভাবিক শালীনতা-বোধ এই মধু উৎসবের কোলাহলে ব্যাহত হইত। গৃহের

আনন্দোৎসবের দিনে সে অলঙ্কারগুলি পরিত। বিশেষ করিয়া পরিত তাহার বিবাহের তিথিতে। উজ্জয়িনীর সর্ব্বত্রই পুরনারী-দের মধ্যে যৌবনশ্রীর অলঙ্কাররাজির আলোচনা চলিত— প্রত্যেকের কামনার বস্তু ছিল সেগুলি। আজ মধু উৎসবে সেই অলঙ্কারের শোভায় মালতীবকুলকে অপরূপ দেখাইতেছিল। তাহার চারিপাশে উৎসুকী পুরনারীদের সমাবেশ। আমি দূর হইতে তাহাই দেখিতেছিলাম। আর ভাবিতেছিলাম কত নির্ব্বিবাদে যৌবনশ্রী এগুলি পাঠাইয়া দিল। আমি অত্যন্ত কঠিন ভাষায় তাহাকে একখানি পত্রে জানাইয়াছিলাম রত্ন পেটিকার অলঙ্কাররাজির পরে তাহার কোনও অধিকার নাই। সে যেন পত্রবাহকের হস্তে সমুদয় অলঙ্কার অর্পণ করে।

আশঙ্কা করিয়াছিলাম ভূষণপ্রিয়া রমণী সহজে তাহার ভূষণ হাতছাড়া করিতে চাহিবে না। তাহার জন্য মনের মধ্যে ক্রোধ বাড়িতেছিল। কি উপায়ে সেই দুর্ব্বিনীতাকে শাস্তি দেওয়া যায় তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এমন সময়ে অশ্বারোহী পত্রবাহক ফিরিয়া আসিল। তাহার হস্তে যৌবনশ্রীর মণিমঞ্জুষা। আমি তাহা তুলিয়া লইয়া গেলাম। মালতীবকুলের পদপ্রান্তে তাহা রাখিয়া কহিলাম—তোমার বসন্তসজ্জা সুরু হউক এইবার।

মধু উৎসবের সহস্র বাতিকে নিষ্প্রভ করিয়া মালতীবকুলের উজ্জ্বল দেহলতা জ্বলিতেছে—ঝক্ ঝক্ করিয়া। সেদিকে চাহিয়া

সুখী হইতে পারিতেছিলাম না কেন? কেন গৃহের সেই শান্তি পরিবেশকে বড় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে? কেন শ্রীর লক্ষ্মী-মণ্ডিত মূর্ত্তিখানি জাগিতেছে এ অলঙ্কারের সঙ্গে জড়িত হইয়া?

রাত্রি গভীর হইয়াছে, উৎসবক্লান্ত নরনারী ইতস্ততঃ নিদ্রা-ক্লান্ত। সহসা চঞ্চলপদে মালতীবকুল আসিয়া আমাকে কহিল—আমাকে এমন করিয়া অপমান করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

চমকিয়া কহিলাম—কিসের অপমান?

সে কহিল—যৌবনশ্রীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারখানি আমাকে দাও নাই তুমি।

বুঝিতে পারিলাম না—সেই বুঝাইয়া দিল—তাহার সেই হীরকখচিত কণ্ঠহারখানি কোথায়? যাহা তুমি তাহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনিয়া দিয়াছিলে?

চাহিয়া দেখিলাম—সত্যই বটে, সেই অপূর্ব্ব অমূল্য হীরকখচিত কণ্ঠহারখানি নাই। অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম—ভাবিতেছিলাম অতীতের কাহিনী। হীরক কণ্ঠহারখানির একটি ইতিহাস ছিল। আমার বিবাহের পরের বৎসরই পিতার আদেশে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলাম। ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত লাভ হইয়াছিল। তখন যৌবনশ্রীকে বড় ভালবাসিতাম! তাহাকে আমার গভীর ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে একখানি অলঙ্কার দিব স্থির করিলাম। শুনিয়াছিলাম

দাক্ষিণাত্যের হীরক বড় সুন্দর। তাই বহু যত্নে আহরণ করিয়াছিলাম একখানি হীরক। জহুরীরা সকলেই হীরকখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিল। সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে গাঁথিয়া আনিয়া যৌবনশ্রীকে দিয়াছিলাম সেইখানি! তাহার শুভ্র কোমল মরাল গ্রীবায় মানাইয়াছিল বড় সুন্দর। পিতা সেকালের প্রসিদ্ধ মণিকার ছিলেন। সহজে কোনও মণি তাঁর পছন্দ হইত না। তিনিও হীরকখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর শ্রী বড় ভালবাসিত তাহার এই কণ্ঠহারখানি—সম্ভবতঃ আমার দেওয়া প্রথম উপহার বলিয়াই। অন্য অলঙ্কার না পরিলেও এখানি সর্ব্বদা তাহার কণ্ঠে থাকিত, কখনও তাহা খুলিতে দেখি নাই।

ভাবিতে ভাবিতে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়াছিলাম। মালতীবকুলের কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিলাম। অতীতের সেই সুখস্বপ্নমগ্ন-কানে মালতীর কণ্ঠস্বর বড় রূঢ় হইয়া বাজিল। সে কহিতেছিল—এই জন্যই আমি মধু উৎসবে আসিতে চাহি নাই। এমনভাবে অপমানিত হওয়ার গ্লানি আমার পক্ষে অসহ্য—আমি এখনই ইহার প্রতিকার চাই।

ভাল লাগিতেছিল না—আর এই অলঙ্কার লইয়া হানাহানি। তার গ্লানি আমাকে পীড়ন করিতেছিল সর্ব্বদেহে ও মনে। উহার উপরে মালতীবকুলের ক্রুদ্ধ মুখচ্ছবি আমাকে আরও বিপন্ন

করিয়া তুলিল। কহিলাম—কাল প্রত্যুষেই তুমি অলঙ্কারখানি পাইবে—আমি ব্যবস্থা করিতেছি।

সে কহিল—অত বিলম্ব করিতে পারিব না, আজই, এখনই আমাকে আনাইয়া দাও—যাহারা আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছে তাহাদের দেখাইয়া অপমান ভুলিব।

কহিলাম—এত রাত্রে ?

সে কহিল—কেন নয় ? মালতীবকুল কি এতই তুচ্ছ যে এটুকু ক্লেশ তাহার জন্য করা চলে না ?

একটুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কহিলাম, আচ্ছা, আনিয়া দিতেছি।

ক্লান্ত পদক্ষেপে উদ্যানের দ্বার পর্য্যন্ত আসিতেই দেখিলাম—মালতীবকুলও আসিয়াছে। আমাকে আসিতে দেখিয়া হাসিয়া কহিল—শুনিয়াছি শ্রেষ্ঠিপত্নী রূপসী ঃ চল, তাঁহার রূপ স্বচক্ষে দেখিয়া আসি।

কহিলাম—কি প্রয়োজন ? রূপে সে তোমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

কহিল—তবে গুণবতীকেই দেখিয়া আসি।

তাহার কোনও কাজে বাধা দিবার ক্ষমতা হারাইয়াছিলাম।

শুষ্কস্বরে কহিলাম—চল।

আজ কতদিন পরে 'মতি মঞ্জিলে'র দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দীর্ঘ তিন বৎসর। কিন্তু তাহাতেই কী এমন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? এমন সুশোভিত উদ্যানের কোথাও এতটুকু কিছু অবশিষ্ট নাই। অযত্নে সব ঝরিয়া গিয়াছে। কত আদরের উদ্যান আমার। আহা শেষ হইয়া গিয়াছে সব। পুত্রের স্বহস্ত রোপিত দুইটি কদম্ব বৃক্ষ ছিল সোপানের দুই পার্শ্বে—দেখিলাম দুইটি বৃক্ষই শুকাইয়া গিয়াছে। কেমন যেন করিতে লাগিল সমস্ত মনটা। মালতীবকুলের ডাকে চেতনা আসিল। উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। বিস্মিত হইলাম! প্রাসাদ দ্বার উন্মুক্ত। এতরাত্রে ব্যাপারটির অস্বাভাবিকতা মনকে পীড়ন করিতে লাগিল। মালতীবকুল মৃদুহাস্যে কহিল, শ্রেষ্ঠিপত্নী মধু-উৎসবে গিয়াছেন। মনে হইল—তাহাই সম্ভব। তাই সেই হীরককণ্ঠহারখানি দেয় নাই, মধু উৎসবেই সে গিয়াছে।

দেখিতেছিলাম আমার পিতৃপুরুষের সেই সুসজ্জিত শোভাময় প্রাসাদ! কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! বৃহৎ তৈলচিত্রগুলি অপরিস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। তথাপি তাহারই মধ্য দিয়া পিতৃপিতামহের দৃষ্টি যেন উজ্জ্বল হইয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাকে তীব্র তিরস্কার করিতেছিল। সেই নীরব ভৎর্সনা—অসংস্কৃত প্রাসাদের অস্বস্তিকর আবহাওয়া—দীপাধারের স্বল্পালোকে সমস্তই অসহ্য লাগিতেছিল। মালতীকে কহিলাম—

তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি যৌবনশ্রীকে ডাকিয়া আনি। উপরের শয্যাকক্ষে পুত্র হয়তো এখন নিদ্রিত—তাহাকে জাগাইতে পারিব না। মালতীবকুলও হয়তো বা প্রাসাদের স্থির গাম্ভীর্য্যে বিচলিত হইয়াছিল—সে কহিল, বেশী বিলম্ব করিও না।

আমি দ্রুত উপরে উঠিতে লাগিলাম।

দ্বিতলের অলিন্দে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে—তাহারই স্বল্প আলোয় দেখিলাম একটি শীর্ণা রমণীমূর্ত্তি শয্যাকক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘদিনের অদর্শনেও বিন্দুমাত্র চিনিতে ভুল হইল না—যৌবনশ্রী। কিন্তু কী পরিবর্ত্তন! সেই অসামান্য রূপের এতটুকুও অবশিষ্ট নাই। কেবল দুইটি চক্ষু অসম্ভব দীপ্তিময়। পিছন ফিরিয়া আমার পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল সে। পরক্ষণেই আমার পাশ কাটাইয়া নীচে নামিবার উদ্যোগ করিল। আমি তাহার পথরোধ করিয়া কহিলাম—এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ? সে চোখ তুলিয়া চাহিল—চোখ দুইটি দুইখানি হীরকের মত জ্বলিতেছে। সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে বেতস পত্রের মত। হস্তস্খলিত হইয়া পাষাণ ভিত্তির পরে গড়াইয়া পড়িল সেই হীরকখচিত কণ্ঠহারখানি।

কহিলাম—কাহাকে দিতে চলিয়াছ এই কণ্ঠহার?

মুখের পানে চাহিয়া কহিল—চলিয়াছি চন্দনকাষ্ঠ ক্রয় করিবার জন্য। কহিলাম—হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছ। বিশ্বাস

যোগ্য একটা মিথ্যাও বানাইতে পারিলে না? চন্দন কাষ্ঠে কি হইবে এত রাত্রে?

সৎকার।

বুক কাঁপিয়া উঠিল—কহিলাম—কাহার?

স্থির অকম্পিত স্বরে সে কহিল—পুত্রের, সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কণ্ঠহারখানি প্রসাধন পেটিকায় ছিল—প্রাতে যখন মণিমঞ্জুষা তোমাকে পাঠাইয়া দেই তখন তাহা জানিতাম না! এখন সৎকারের উপায় খুঁজিতে গিয়া দেখি এখানি পড়িয়া রহিয়াছে। জীবনে যে অনাদর আর অপমান বহিয়া গেল—চন্দনকাষ্ঠ আর ঘৃতে তাহাকে রাজপুত্রের মত সমারোহে সৎকার করিয়া সান্ত্বনা পাইব ভাবিয়াছিলাম—তাই কণ্ঠহার বিক্রয় করিতে চলিয়াছি।

কি করিতেছিলাম জানিনা—চোখের সম্মুখে সব কেন কাঁপে? কাহার সৎকার? কিসের কণ্ঠহার? জ্বলিতেছে ভূমিতলে ও কী হীরক? না না ও যে বিষধর সর্প—ওরে মাণিক—ওরে পুত্র, পলাইয়া আয়—তোকে দংশন করিবে।

চেতনা হারাইতেছিলাম—

খিল খিল খিল খিল হাসির শব্দে চোখ মেলিলাম—আঃ কে হাসে? পুত্র এখনই জাগিবে যে। সোপানের মুখে ও কে? কি কহিতেছে? ভট্টারক! এই তোমার রূপসী শ্রী?

আবার সে তরঙ্গ তুলিয়া হাসিয়া উঠিল। কে ভট্টারক? কাহার শ্রী? কিন্তু অমন করিয়া হাসিলে পুত্রের নিদ্রা এখনই ভাঙ্গিবে যে। সবলে মালতীবকুলের কোমল কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিলাম। ফিস ফিস করিয়া রুদ্ধস্বরে কহিলাম, চুপ! পুত্র জাগিবে যে।

মুক্তির আশায় মালতীবকুলের দেহটা ছটফট করিতে লাগিল। আমিও ততই পুত্রের নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় তাহার শব্দরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিল—আমারও সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল। পদস্খলিত হইয়া প্রশস্ত সোপান বাহিয়া গড়াইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙ্গিতেছে নাকি? এ কে আমার পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। এ যে মালতীবকুল, সেই আঁখি, সেই বর্ণ, সেই অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব। ঝাপ্‌সা লাগিতেছে কেন? মালতী-বকুলের সেই হাসি কোথায়? ওর চোখে তো কখনও জল পড়ে নাই।

এ কি গোলমাল হইয়া যাইতেছে? কে কাঁদে? কেন কাঁদে? আমাকে ডাকে কেন?

চোখ মেলিলাম। আমার পায়ের পরে পড়িয়া পত্নী মর্ম্মভেদী স্বরে বিলাপ করিতেছেন। আমি চেয়ার হইতে মাটিতে

পড়িয়া গিয়াছি। ভাঙ্গা টেবিলের কোনায় কপালে গভীর ক্ষত হইয়াছে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আকুল হইয়া কাঁদিতেছে মালতীবকুল তাহার একমাত্র পুত্রের শোকে। চক্রনেমির আবর্ত্তনে সে আজ পুত্রহারা জননী। কিন্তু আমার তো শোক করিবার অবসর নাই। সৎকারের ব্যবস্থা তো করিতে হইবে। টেবিলের পরে সেই চেনছড়াটি ও তাহার কৃত্রিম লকেট পড়িয়া রহিয়াছে। পুণ্যময়ী যৌবনশ্রীর কণ্ঠহারে তাহার পুত্রের অন্ত্যেষ্টির আয়োজন সম্ভবপর হইলেও নিষ্ঠাহীনা মালতীবকুলের কণ্ঠহারে তো তাহার পুত্রের শেষ কার্য্যের সংস্থান হইবে না। ইহাই মহাকালের নির্ম্মম বিধান।

নটরাজ

ছোট সাঁওতাল পল্লী। পাহাড়ে জায়গা, চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর অধিবাসীর বাস সেখানে। সরল সহজ জীবনযাত্রা; জীবন-যাত্রায় তাদের আদিম মনোভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণ! বন্যজাতি সুলভ কুসংস্কার, সরল অন্ধবিশ্বাস ওদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আজও। তবে বাইরের জগতের আধুনিকতা যে এদের একেবারে রেহাই দিয়েছে তা' নয়—সেকথা এদের মেয়েদের সাজসজ্জার দিকে তাকালে খানিকটা বোঝা যায়—হাতে ওদের কাঁচের চুড়ির বর্ণ বৈচিত্র্য—কবরীতে রেশমী ফিতের অভাব নেই, গলায় বাহারে রঙিন পাথর কিংবা পুঁতির মালা চোখে পড়ে। দুপুর বেলা পুরুষেরা যখন বাইরে যায় শিকারে কিংবা সহরে জন খাটতে তখন ফেরীওয়ালারা আসে তাদের পসরা নিয়ে এদের ছোট্ট পল্লীতে। সরলা, সহজে প্রলুব্ধা এই সাঁওতালী রমণীদের কাছে ওদের

সস্তা বাজে জিনিষ বিকোতে বিন্দুমাত্রও দেরী হয় না। কষ্টে উপার্জিত অর্থ এবং এমনি করে কাঁচের বিনিময়ে বিলিয়ে দেয়—কিন্তু তাতে এদের ক্ষোভ নেই। যে জিনিষটি এরা পায় ওদের সৌন্দর্যপিপাসু চোখে তাই ভাল লাগে—রংদার ছিটের জামা থেকে সুরু করে কপালের টিপটি পর্যন্ত এদের মনকে টানে।

রঙ্গিলা এই দলেরই মেয়ে। দীর্ঘায়ত দেহটি তার সুন্দর—কালো রংয়ে যতখানি সৌন্দর্য থাকা সম্ভব তা' তার আছে। চমৎকার দুটি চোখ—সরল হাসি—কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশভার। চমৎকার গাইতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর ওর নাচের ছন্দ। এত সুন্দর সাবলীল ওর দেহের ভঙ্গী যা' মনকে বিস্মিত করে—মুগ্ধ করে।

সে নাচ যে দেখে সেই খুসী হয়—প্রশংসা করে। মাথার কালো চুলে পলাশফুল—হাতে গলায় কড়ির মালা—নৃত্যরতা রঙ্গিলাকে দেখলে মনে হয় যেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একখানি দেবদাসী চিত্র সজীব হয়ে উঠেছে।

কিন্তু একা রঙ্গিলাকে দেখলে এই নাচের সৌন্দর্য সবটা বোঝা যায় না। ওর নৃত্যসঙ্গী ঝমরু। সাঁওতালী ছেলে, সুস্থ সবল দেহ, প্রাণশক্তিতে সমুজ্জ্বল চেহারা তার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারে। বেশীর ভাগ সময়েই ওকে দেখা যায় বাঁশী বাজাতে। শিকারে ওর মন

নেই একেবারে। সেজন্য ওর বুড়ো বাপের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সাঁওতালী ছেলে—সারাদিন সে খেলে কাটায়, বাঁশী বাজায়, ফুলের মালা গাঁথে আর রঙ্গিলার সঙ্গে নেচে বেড়ায়। ছিঃ এই কি তার উপযুক্ত কাজ? বংশের একটা মর্যাদা বোধ পর্যন্ত তার নেই। এ নিয়ে বুড়ো অনেক অভিযোগ করেছে ছেলে তার বাধ্য নয়—সে কোনও কথাই কানে তোলে নি। শিকার করতে তার মন চায় না; মায়া লাগে। সাঁওতালের ঘরে এমন কথা কেউ কখনও শোনে নি। বাপ অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়—ঝমরুর বন্ধুরা উপহাস করে।

তা' করুক, ঝমরুর তাতে কিছু আসে যায় না। সে বাঁশী বাজাতে পারলেই খুসী আর খুসী রঙ্গিলার সঙ্গে নেচে গান করে। ঝমরুর সবচেয়ে সুন্দর নাচ—নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য। সে যে কী অপূর্ব্ব না দেখলে বোঝা যায় না, দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্ত্তিখানি যেন সজীব হয়ে ওঠে। হাতে তার তেমনি করে বাজে ডমরু—গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়া চুল জটার মত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। হাতে গলায় জড়ানো লতার সাপ।

সহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা মাঝে মাঝে ওর নাচ দেখে যান—জিজ্ঞাসা করেন এমন সুন্দর নাচ ও শিখেছে কোথায়? ভারী চমৎকার একটি হাসি হেসে সে জবাব দিয়েছে, বলতে নিষেধ আছে।

এমনি দিন চলেছে তাদের। সারাদিনের পরিশ্রমের পর খোলা মাঠে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় যখন সাঁওতালীরা আসর জমায়—মেয়ে পুরুষে। হাড়িয়া খেয়ে দলে দলে উৎসবে যোগ দেয়, তখন তাদের মাদলের তালে নাচ স্বরু হয় রঙ্গিলা ও ঝমরুর। সাপুড়ে নাচ স্বরু করে তারা ঝমরুর বাঁশের বাঁশীর স্বরের সঙ্গে তাল রেখে। পায়ের তাল হয়ে ওঠে দ্রুত, বাঁশীর স্বর হয় তীক্ষ্ণ মাদকতাময়। হাতের ভঙ্গী তাদের অপরূপ, চোখের দৃষ্টি জ্বলে ওঠে বর্শা ফলকের মত। সাঁওতালীরা মুগ্ধ হয়ে দেখে। তারা ভুলে যায় ঝমরু শিকার জানে না—সে তাদের জাতের কলঙ্ক। মেয়েরা ভুলে যায় রঙ্গিলার অহঙ্কারী দর্পিত স্বভাব। তারা সবাই খুসী হয় এই আনন্দোৎসবে। ঝমরুর বুড়ো বাপও সাময়িক ভাবে বংশ মর্যাদা ভুলে পুত্রগর্বে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। রাত্রি ক্রমশঃ বেড়ে চলে, চাঁদ শাল পিয়ালের বনের অন্তরালে নেমে যায়। হাড়িয়ার নেশায় মাতাল সাঁওতালীরা সেখানেই শুয়ে পড়ে—মাদলের বাজনা থেমে যায়। ঝমরু আর রঙ্গিলার নাচ শেষ হয়—ওরা হাত ধরাধরি করে নদীর পারে এসে বসে। দূর বন থেকে ভেসে আসে মহুয়ার মাতাল করা মিষ্টি গন্ধ।

সাঁওতাল পল্লীর পাশে কয়েকখানি তাঁবু পড়েছে। কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরুণ অধ্যাপক তার

কাজে বেরিয়েছে। কাছাকাছি কোথায় একটা জায়গায় আবিষ্কার উদ্দেশ্যে কিছুদিন ধরে খুব খানিকটা খোঁড়াখুঁড়ির পরে রিপোর্ট লেখার কাজে সে এখন ব্যস্ত। সাঁওতাল পল্লীর নির্জ্জনতায় কাজটা বেশ সহজে সমাধা হবে সেইজন্য এখানে তাঁবু ফেলা হয়েছে। অধ্যাপক মাদ্রাজী। নাম আপ্পারাও। বুদ্ধিমান ছেলে—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ইতিমধ্যে যথেষ্ট কাজ করেছে। কর্তৃপক্ষ তাকে দিয়ে অনেক কিছু আশা করেন। ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ চোখ দুটিতে সব সময়েই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। নির্ভীক মনে দুঃসাহসিকতার অন্ত নেই। এই কাজে বহুবার অসমসাহসিকতার পরিচয় সে দিয়েছে। এখানে এই সাঁওতাল পল্লীতে তাঁবু ফেলা সেও আপ্পার আকাঙ্খাতেই। সে আশা করে এই সাঁওতালীদের জীবন ধারায় লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের কাহিনী কিছুটা সংগ্রহ করা যেতে পারে। ওদের জীবনযাত্রায় প্রাচীনত্ব আছে যথেষ্ট, সেই হিসাবে মৌলিকত্ব আছে। সহজ সৌন্দর্য্য প্রিয় জাতি ওরা—আর্টের একটা প্রাণগতি ওদের জীবনছন্দে ধরা পড়বেই—আপ্পারাও-এর কাছে সে ইতিহাসের মূল্য অনেক।

সারাদিনের কাজের পরে ক্লান্ত আপ্পা সন্ধ্যার পরে এসেছে নদীর ধারে। অজস্র মহুয়া ফুল ফুটেছে গন্ধে বাতাস ভারী। চাঁদের আলোয় সমস্ত পৃথিবী ভরে গেছে নদীর জলে তারই

খেলা। আপ্পারাও-এর ক্লান্ত মনে একটা শান্তির স্পর্শ দিয়ে গেল। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাদলের ধ্বনি। শালবনে সাঁওতালি উৎসব সুরু হয়েছে। বাঁশের বাঁশীতে আর ঝুমুর গানে জ্যোৎস্নারাত্রি মাতাল হয়ে উঠেছে। আপ্পারাও-এর ভারী ইচ্ছে হল উৎসবটা প্রত্যক্ষ দেখে আসে। এর আগে ও কখনো সাঁওতালি উৎসব দেখেনি। নদীর পার ছেড়ে আপ্পা ধীরে ধীরে শালবনের কাছে এসে দাঁড়াল।

শীতের আরম্ভ। ঠাণ্ডার আমেজ রয়েছে বাতাসে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোক হাল্কা সাদা কুয়াশায় ম্লান হয়ে এসেছে। একটু দূরে ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে সাঁওতালিদের। ঝুমুর গানের রেশ চলেছে তখনও। আপ্পা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল একটা শাল গাছে হেলান দিয়ে। হঠাৎ চমকে উঠে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আশ্চর্য তো। এখানে এমন নটরাজ মূর্তি এলো কোথা থেকে? এমন জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ এমন নিখুঁত প্রতিমা তো সে কখনও দেখেনি, কোনও ম্যুজিয়ামে পর্য্যন্ত নয়। এই লোকালয় বর্জিত শালবন, এ মূর্তি এখানে এলো কোথা থেকে?

মুহূর্তমাত্র। তার পরেই আপ্পারাও নিজের ভুল বুঝতে পেরে একটুখানি লজ্জিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার বিস্ময় কম্‌ল না। মূর্তি নয়—জীবিত মানুষ! নৃত্যশিল্পী সাঁওতালী

যুবক। তার তীক্ষ্ণ চোখকে পর্য্যন্ত প্রতারিত করেছে। হ্যাঁ জীবন্ত নটরাজই বটে, নিকষ কালো দেহ, কুঞ্চিত কেশদাম জড়িয়ে লতার সাপ দেখা যাচ্ছে।

হাতের ডমরু বাজছে গুরু-গুরু-গুরু। কি বিস্ময়কর অনুকরণ—কি প্রতিভাবান ঐ যুবক। আপ্পার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আরও অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠলো শালবনের আলোছায়ার পটভূমিকায়। মাদলের তালে ঘুমুরের মিঠে বোল শোনা গেল। একখানি নারী প্রতিমা নাচের তালে ছুটে এলো সেখানে। আপ্পার মনে হল অজন্তা চিত্রের নর্ত্তকী মূর্ত্তি যেন সজীবরূপ পরিগ্রহ করেছে। তারপরে সুরু হল দেবদাসী নৃত্য। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে দেহমনকে দেবতার চরণে উৎসর্গ করার রমণীয় দৃশ্যটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো তার চোখের সম্মুখে।

অনেক রাত্রে আপ্পারাও নদীর ধারে এলো বেড়াতে সন্ধ্যার সাঁওতালি নৃত্যে তার সমস্ত মন তখনও উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। ঘুম আসছে না। তার পায়ের শব্দে চকিত হয়ে নদীর পার হতে উঠে দাঁড়ালো দুটি নরনারী হাত ধরাধরি করে চলে গেল বাঁকা নদীর পথ মাড়িয়ে শালবনের ভিতর দিয়ে দূর সাঁওতাল পল্লীর দিকে। আপ্পা চিনতে ভুল করলে না—এরা সেই দুটি যাদুকর ও যাদুকরী। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের জীবন্ত প্রতিমা। কিসের চিন্তায় আপ্পারাও নিমগ্ন হয়ে গেল।

কদিন কেটে গেছে। আপ্পার সঙ্গে ঝমরু ও রঙ্গিলার যথেষ্ট আলাপ হয়েছে। বহুবার তাদের নাচ দেখে সে খুসী হয়েছে। কিন্তু ঝমরু আপ্পার শত অনুরোধেও বলতে চায় না কার কাছে ওরা নাচ শিখেছে। শুধু হাসে আর জবাব এড়িয়ে যায়। অথচ আপ্পার সন্ধানী মন কেবলই বলতে থাকে এ নাচের উৎস কোথায়। সোজাপথে উপায় নেই, আপ্পা বাঁকা পথ ধরলে। রঙ্গিলার সঙ্গে আলাপটাকে সে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে নিয়ে এলো। নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে রঙ্গিলাকে চকোলেট, কেক, চা, বিস্কুট খাইয়ে ভারী খুসী করে দিলে। ক্যামেরায় তোলা নিজের ছবি দেখে রঙ্গিলা অবাক হয়ে যায়! কত ছবি, কত অ্যালবাম সে মুক্ত হস্তে দান করতে লাগলো রঙ্গিলাকে। কলকাতা থেকে পার্শেলে এলো তার জন্য সৌখীন জিনিষ সব। এতখানি আদর আপ্যায়ন সাঁওতাল পল্লীতে সমালোচনার সৃষ্টি করলে। ঝমরু পর্য্যন্ত ওদের পরে বিরূপ হয়ে উঠলো, সে বারবার নিষেধ করেছে রঙ্গিলাকে আপ্পার সঙ্গে মিশতে কিন্তু প্রলুব্ধা রমণী সে কথায় কর্ণপাত করেনি। ঝমরু অবশেষে নিরুপায় হয়ে ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—খবরদার রঙ্গি, নাচের খবর ওকে দিবি না—তাহলে সর্বনাশ হবে।' রঙ্গিলা মুখ টিপে হেসে বলেছে—"আচ্ছারে আচ্ছা, সে কথা বলব না।"

ঝমরু আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেছে।

আপ্পারাও এর উদ্দেশ্য অবশেষে সফল হয়েছে। রঙ্গিলাকে কলকাতা নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখানোয় কাজ হয়েছে। তারই লোভে রঙ্গিলা অনিচ্ছা সত্বেও রাজী হয়েছে আপ্পাকে নিয়ে যেতে যেখানে তারা নাচ শেখে। কিন্তু অতি গোপনে।

দ্বিপ্রহর রাত। জ্যোৎস্নায় চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। আপ্পা তাঁবুর বাইরে এলো। হাতে টর্চ আর একটা লাঠি। বাইরের জ্যোৎস্নায় দেখা গেল রঙ্গিলার দীর্ঘ দেহখানি মহুয়া গাছে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে। চারিদিকে শীতের ম্লান কুয়াসা। নিঃশব্দে দুজনে হেঁটে চলল পাশাপাশি, আপ্পার মন অজ্ঞাত রহস্য আবিস্কারের নেশায় চঞ্চল। সাঁওতাল পল্লীর শেষে শালবনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট পাহাড়, তার আদি বা অন্ত চোখে পড়ে না। নিবিড় জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের পাদভূমি। আপ্পা থমকে দাঁড়াল, এই রাত্রে জঙ্গলে ঢুকতে হ'বে নাকি—সর্ব্বনাশ! রঙ্গিলা হেসে বল্লে—"ভয় নেই আসুন, পথ আছে।" সর্ব্বনাশা মেয়েটা নির্বিবাদে নুয়ে পড়া লতাগুলি দুহাতে সরিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়লো। অগত্যা নিজের পৌরুষে আঘাত লাগার ভয়ে লাঠিটি মাত্র নির্ভর করে আপ্পা তার পশ্চাদানুসরণ করলে। ঝোপের মাঝে সুন্দর পরিস্কার পথ—প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নির্মিত মনে হয়। মিনিট

পনোরো হাঁটার পরে পাহাড়ের গায়ে এসে দাঁড়ালো তারা। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আপ্পার হাতে টর্চ্চ জ্বলে উঠলো। আপ্পা দেখলে কখন তারা পাহাড়ের গুহার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশাল গুহা—মন্দিরের মত আকার। টর্চ্চের আলো পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হল। চোখের ধাঁধা কাটতেই আপ্পার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হল এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রাচীর গাত্রে সংখ্যাতীত মূর্ত্তি। নানাভঙ্গীতে তাদের দেহ অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করছে। পর্ব্বত মন্দিরের অন্ধকারে নটরাজ বিগ্রহ। প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বের প্রস্তরে পদ্ম ও শঙ্খ উৎকীর্ণ। চতুর্ভুজ নটরাজ মূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্তে ডম্বরু, বামে অগ্নিখেটক, অপর দুখানি হস্ত নৃত্য ভঙ্গীতে লীলায়িত। পিঙ্গল জটাভারে চন্দ্রকলা, সর্পমালা কণ্ঠ জড়িয়ে মাথার উপরে ধরেছে রাজছত্র, গুহাগৃহের অভ্যন্তরে নাগকন্যার অপরূপ লীলায়িত দেহ সৌন্দর্য্য বিস্ময় সৃষ্টি করে। দেহের নিম্নাঙ্গ নাগিনী—উত্তমাংশ লাবণ্যময়ী নারীর—অধরের কোণে রহস্যময় হাসির রেখা। অঞ্জলীবদ্ধ হস্ত দুখানিতে, নমিত আঁখির পাতায় দেবদাসীর উৎসর্গিত জীবনের চিত্রটি সুমধুর ভাবে ফুটে উঠেছে। এ কী দৃশ্য! এ কী সৌন্দর্য্য—এ কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্য কার ছিল—কারা এর শিল্পী—কোন শতাব্দীর এরা—কোন অতীতযুগের সভ্যতা পাহাড়ের বুকে অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করেছে। আপ্পা

উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলো। নটরাজের চোখদুটি অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্বলছে। বোধহয় কোনও মূল্যবান পাথর বসানো। নটরাজের কণ্ঠ জড়িয়ে মাথার উপরে ছত্র ধরে রয়েছে নাগেশ্বর। দেখে মনে হয় সারা মন্দির প্রতীক্ষা করে আছে। এখনি শঙ্খঘণ্টার আরতি সুরু হবে—ধূপ ও গুগ্‌গুলে মন্দির যেন সুরভিত। পাষাণী দেবদাসীরা এখনি নৃত্যপরা হয়ে উঠবে। আর সেই সঙ্গে মন্দির মুখরিত করে শিবের তাণ্ডব নৃত্য জেগে উঠবে। ডম্বরুর ধ্বনি জেগে উঠবে সমস্ত পর্ব্বতগাত্র কম্পিত করে। কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতের অপেক্ষায় এরা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে—এখনি পূজা সুরু হবে—চঞ্চল প্রাণশক্তিতে সারা মন্দির স্পন্দিত হয়ে উঠবে। অলৌকিক সে দৃশ্য দেখার আগ্রহে আপ্পারাও বিশ্বজগৎ ভুলে গেল—ভুলে গেল পারিপার্শ্বিক, ভুলে গেল রঙ্গিলার উপস্থিতি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে নটরাজ মূর্ত্তির পায়ের কাছে। টর্চ্চের আলো নিভে এলো। মন্দির গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করল।

ফিরবার পথে আপ্পা বিশেষ কোনও কথা বলেনি, রঙ্গিলাও আপ্পার ভাবগতিকে চুপ করে গেছে। একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল—জায়গাটা ঝমরু ও রঙ্গিলার আবিষ্কার। হঠাৎ তারা একদিন এখানে এসে পড়েছিল তার পর থেকে ওখানে দুজনে তারা নাচের অভ্যাস করেছে। ওই মূর্ত্তিগুলিই তাদের

নাচের খোরাক জুটিয়েছে। ক্রমে সাঁওতালী পল্লীর সকলে জেনেছে এই মন্দিরের কথা—তারা সভয় বিস্ময়ে মন্দিরের বাইরে এসে পরবের দিনে সমবেত হয়—সেখান থেকেই পূজা উৎসব সম্পন্ন করে ফিরে যায়। মন্দিরের ভিতরে বড় কেউ একটা ঢোকে না, আপ্পা মনে মনে ওদের শিল্পী প্রাণকে শ্রদ্ধা না করে পারেনি। খানিকটা স্তব্ধ মনেই সে তাঁবুতে ফিরে এল—রাত্রি প্রভাতের তখন আর বিশেষ দেরী নেই।

পুরো দুদিন ধরে আপ্পা চিন্তা করল। সে চিন্তার আর শেষ নেই। রঙ্গিলা ওকে বলেছে সাঁওতালিরা কোনও বিদেশীকে ওই মন্দিরের খবর দিতে নারাজ। আজকাল ইংরাজী পড়া ছাত্রবাবুদের কী যে এক অদ্ভুত খেয়াল হয়েছে মূর্ত্তি পেলেই তারা নিয়ে চলে যায়—সেইজন্যে ওরা সাবধানতা অবলম্বন করেছে। কথা শেষে রঙ্গিলা আপ্পাকে সাবধান করে দিয়েছে আপ্পা যেন ওসব খারাপ মতলব কিছু না করে—উনি ভারী জাগ্রত দেবতা—ওঁকে ছোঁয়া যায় না! নটরাজ মূর্ত্তি স্পর্শ করলেই নাকি মৃত্যু। এমন নাকি ওরা দুই তিনজনকে দিয়ে প্রত্যক্ষ দেখেছে। শিবের মণিময় চোখদুটোর পরে কেউ কেউ লোভ করেছিল কিন্তু দেবতার অভিশাপে তাঁর চোখের আগুনে তারা মরে গেছে।

কাহিনী শুনে আপ্পার চিন্তার উপশম হলনা। রহস্যময় মৃত্যুরূপী নটরাজের পরে আকর্ষণ তার আরও তীব্র হয়ে উঠলো।

ও মূর্ত্তিখানি তার একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় আর্টের এমন একটা অপূর্ব্ব অধ্যায় লুপ্ত হতে দিতে সে পারে না। ও মূর্ত্তি তার চাই। মূর্ত্তিখানি একাকী তার পক্ষে বহন করা কঠিন কিন্তু কুলীদের নিয়ে ওখানে যাওয়া অসম্ভব, সব জানাজানি হয়ে যাবে! একাই তাকে যেতে হবে কঠিন হলেও অসম্ভব নয়— নিকষ কালো পাথরের নির্ম্মিত নটরাজ মূর্ত্তিখানি আপ্পার সবল বাহু বহন করতে পারবে আর পারতেই যে হবে। নটরাজ তাকে টানছেন গভীর জঙ্গলে পর্ব্বতের অন্তরালে—অপরূপ তাঁর সৌন্দর্য্য-অসীম তাঁর প্রাণশক্তি। সে আহ্বানকে অগ্রাহ্য করার মত শক্তি আপ্পারাওয়ের নেই।

গভীর রাত্রি জ্যোৎস্নায় রাত্রের পৃথিবীর রূপ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। নির্জ্জন শালবীথির ভিতর দিয়ে দ্রুতপদে আপ্পারাও হেঁটে চলেছে পাহাড়ের দিকে। শালবন পার হয়ে সে জঙ্গলে প্রবেশ করল মনের মধ্যে কোনও ভয় তার নেই—পায়ের নীচে শুকনো পাতাগুলি সর্ সর্ শব্দ তুলছে যেন অনধিকারীর প্রবেশে বনপ্রান্তরের সকলকে তারা সাবধান করে দিতে চায়। আপ্পা মন্দিরের ভিতরে এসে ঢুকলো। হাতের তীব্র বৈদ্যুতিক আলো সমস্ত মন্দিরের গায়ে হল প্রতিফলিত। নটরাজের মূর্ত্তিখানি ঝক্ ঝক্ করে জ্বলে উঠলো। আপ্পা আবার মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন জিনিষটিতে তারই অধিকার। তারই একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

আজ শেষরাত্রেই এখানকার তাঁবু উঠিয়ে চলে যেতে হবে। তার সব ব্যবস্থা সে করে এসেছে। কিন্তু নটরাজের চোখে কি তীব্র আলো! জীবন্তচোখ বলে মনে হয়। আপ্পার মনে পড়লো রঙ্গিলার কাছে শোনা মৃত্যুর কাহিনী। এই সেই মৃত্যুরূপী নীলকণ্ঠ—হোক্ মৃত্যুরূপী—এ মূর্ত্তি তার অদৃষ্টে অমৃত সঞ্চয় করে রেখেছে। আপ্পা মূর্ত্তির দিকে এগিয়ে এল, আবার সেই বৈদ্যুতিক আলো নটরাজের পরে প্রতিফলিত হল, অপূর্ব্ব! সবচেয়ে সুন্দর ও বিস্ময়ের হল শিবের কণ্ঠ ভূষণ ঐ নাগরাজ! নীলকণ্ঠের কণ্ঠ বেষ্টন করে নটরাজের মাথার উপরে ছত্র ধরেছে, কি নিখুঁত সুন্দর! কি মসৃন ওর গাত্রচর্ম্ম! পাথরের পরে এমন মাধুর্য্য সজীবতার সঞ্চার এ কি সহজ কথা! নাগরাজের চোখ দুটিতে সম্ভবতঃ দুখানি ক্ষুদ্র প্রবাল বসানো—আলোয় ঝক্ ঝক্ করে উঠছে। সত্যি এ একটা বিপুল ঐশ্বর্য্য বিমুগ্ধ চিত্তে আপ্পা ভাবলে। তারপরে প্রথম দিনের মত হাঁটুগেড়ে নটরাজের উদ্দেশে সে প্রণাম করে দুটি হাতের সবল শক্তিতে শিবমূর্ত্তি আসন হতে তুলে বুকে জড়িয়ে নিল। মুখে সাফল্যের হাসি—না, খুব বেশী ভারী নয় মূর্ত্তিখানি। পরক্ষণেই ভীত চকিত হয়ে উঠলো আপ্পা—ওকি? শিবের নাগ কি জীবিত হয়ে উঠলো নাকি? ওর ফণা অমন দুলছে কেন? ওর ক্রুদ্ধ গর্জ্জনও শোনা যাচ্ছে যেন! তাইতো—এযে সত্যিকারের নাগ! বহুদিন

ধরে শিবের দেহ জড়িয়ে রয়েছে। ক্রুদ্ধ সর্পের ফণা এগিয়ে আসছে আরো কাছে—আরও আরও! নটরাজ! নটরাজ! রক্ষা কর! একটি মুহূর্ত্তে ঘটে গেল এই প্রলয়—সশব্দে নটরাজ মূর্ত্তি স্খলিত হয়ে পড়ে গেল পাষাণ ভিত্তির উপরে আপ্পার অচেতন দেহও লুটিয়ে পড়ল তার পাশে। নির্জ্জন মন্দির আবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

পরদিন শিবের পরব, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালিরা এলো পূজাসম্ভার নিয়ে মন্দিরে। মশালের আলোকে যা' তারা দেখলো তাতে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। শিবমূর্ত্তি আসন থেকে দূরে পড়ে আছে, আর তাঁবুর সেই বিদেশী ভদ্রলোকটির দেহ পড়ে আছে সারা দেহ তার নীল। নটরাজের মাথার নাগেশ্বর আপ্পারাওএর কণ্ঠ জড়িয়ে তেমনি ছত্র ধরে রয়েছে—তবে নিঃশব্দে নয় ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সারা মন্দির প্রকম্পিত করে তুলছে আর দোলাচ্ছে তার বিশাল ফণা।

আপ্পারাওএর পরিণামে তারা কেউ বিস্মিত হ'ল না—কারণ এতো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তারা কেউ বুঝতে পারল না এই বিদেশী জানলো কি করে মন্দিরের খবর। কেবলমাত্র ঝমরু তীব্রদৃষ্টিতে তাকালো রঙ্গিলার দিকে। সে দৃষ্টির সামনে রঙ্গিলার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল সে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

রাত্রি গভীর হইয়াছে। বাহিরের কোথাও এতটুকু জীবনের স্পন্দন অনুভব করা চলে না—বিশাল বিরাট অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে সকলেই গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর তাহার মৃদু আলোক-রেখায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাজ করিতেছে একটি তরুণ। তাহার সম্মুখে একখানি প্রস্তর প্রতিমা। প্রতিমার সর্ব্ব দেহই নির্ম্মিত হইয়াছে, কেবলমাত্র বাকী আছে তাহার নয়ন দু'টি! নয়ন দু'টি যে আঁকা হয় নাই তাহা নহে—নয়ন দুটি মুদ্রিত রহিয়াছে। পদ্মের পাপড়ির ন্যায় কোমল ঈষৎ বঙ্কিম আঁখি যুগলে দৃষ্টি নাই কেন কে বলিবে? ইহা কি শিল্পীর নিজস্ব খেয়াল কিংবা কোনও কারণ রহিয়াছে ইহার পশ্চাতে? কিন্তু তথাপি সেই প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গে যে অপরূপ সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যে মন ভরিয়া উঠে। কঠিন পাষাণের বুকে

এমন কোমল লাবণ্য মাখাইয়া দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। তরুণ শিল্পী সার্থকভাবেই তাহার শিল্প সাধনা করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না।

শিল্পী মাথা নীচু করিয়া প্রতিমার পাদদেশে কয়েকটি অক্ষর সংস্কৃতে উৎকীর্ণ করিতেছিল। এতক্ষণে তাহা শেষ হইল—প্রদীপখানি ধরিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহার পর সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—প্রতিমার পাদদেশে এতক্ষণ বসিয়া সে লিখিয়াছে—

তমসো মা জ্যোতির্গময়

সে যেন ঐ আঁখিহীনার আকুল প্রার্থনা দিনদেবের নিকটে—তেমনই ব্যাকুলতা ঝরিয়া পড়িতেছে সেই পাষাণ প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া—বদ্ধাঞ্জলী মুদিতনেত্রা তরুণীর উর্দ্ধোত্থিত কমল আননে এই একটিমাত্র প্রার্থনাই স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে—

হে দিনদেব—আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও।

অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তরুণের অস্ফুট কণ্ঠস্বর কহিল—

তমসো মা জ্যোতির্গময়

প্রভাত হইয়াছে। বিক্রমশীলা বিদ্যাপীঠের সর্ব্বত্র কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছে। পঞ্চসহস্রাধিক বিদ্যার্থী বিভিন্ন

বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সুদূরপ্রান্ত হইতে জ্ঞানার্থীর সমাবেশ হইয়াছে এখানে। নূতন বিদ্যার্থী আসিয়াছে বিদ্যাপীঠে গৌড় হইতে। তরুণ বয়স কিন্তু অতি কুৎসিৎ দর্শন। কোথাও তাহার মধ্যে এতটুকু শ্রী বা সৌন্দর্য্যের অবশেষ নাই। প্রথম দর্শনেই মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে। মনে হয় এমন কুশ্রীতার আবির্ভাব সংসারে অসুন্দর। কিন্তু তথাপি সেই কুশ্রীতার আড়ালকে অগ্রাহ্য করিবার মত মনের জোর যদি কাহারও থাকে তবে তাহার দৃষ্টিতে পড়িবে তরুণের অপরূপ নয়ন দুইটির সৌন্দর্য্য। অতল গভীর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘায়ত চোখে তাহার—বিশ্বের সমস্ত বাণী ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; আর তাহার উন্নত প্রশস্ত ললাটে স্পর্শিয়াছে প্রজ্ঞা ও মনস্বিতার আভা। সেই বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত ললাটে—সেই দীর্ঘায়ত গভীর চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ কী দেখিয়াছিলেন জানি না—তবু তিনি কিছুক্ষণের জন্য চোখ ফিরাইতে পারেন নাই। তাঁহার সেই অতলস্পর্শী দৃষ্টির সম্মুখে তরুণ আপন কুশ্রীতার জন্য অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া নীরবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অধ্যক্ষ আর তাহাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। কেবলমাত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন—তুমি কি বিষয়ে শিক্ষা লইতে চাও? নত মস্তকেই তরুণ উত্তর দিয়াছিল—ভাস্কর্য্য।

ভাল, তাহাই হইবে কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হইবে—তুমি তোমার ইচ্ছানুরূপ সময় লইয়া তোমার শিক্ষামত একটা কিছু নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে দেখাইও। তোমার নৈপুণ্য অনুসারেই তোমার শিক্ষার ব্যবস্থা করিব।

যুবক মাত্র তিনমাস সময় লইয়াছিল। অধ্যক্ষ তাহাতেই সম্মত হইয়া বিদ্যাপীঠে তাহার জন্য কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি নিরন্তর একাগ্র সাধনায় সে এই মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে। আজ নিশা শেষে তাহার সেই তিনমাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আজই তাই অধ্যক্ষের নিকটে তাহার সৃষ্টিকে উপস্থিত করিবার দিন। সংশয় ও আশার দোলায় তাহার মন দুলিতেছিল।

যথাসময়ে বিদ্যাপীঠের দ্বারী আসিয়া কুণালকে মঠাধ্যক্ষের আহ্বান জানাইল। কুণাল অধ্যক্ষের কক্ষে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহে অধ্যক্ষ কহিলেন—বৎস! তোমাকে এই তিনমাসের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না, তুমি কুশলে ছিলে তো? হাঁ প্রভু। আপন আরব্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়াই আপন কক্ষের বাহিরে কদাচিৎ আসিতাম। তাই প্রভুর চরণে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

তোমার কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে? হাঁ প্রভু। অধ্যক্ষ গৃহের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দ্বারীর প্রতি কহিলেন—কুণালের কক্ষ

হইতে তাহার নির্ম্মিত মূর্ত্তি লইয়া আইস। অনতিবিলম্বেই দ্বারী-বাহিত সেই মূর্ত্তি আসিল। অধ্যক্ষ নিঃশব্দে সেই দৃষ্টিহীনা তরুণীর অপরূপ পাষাণলাবণ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল—তাঁহার সেই নীরব শান্ত মুখচ্ছবির পানে চাহিয়া কুণালের বক্ষ কাঁপিতে লাগিল উদ্বেগ ও আশঙ্কায়। অবশেষে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি কহিলেন: কুণাল? কুণাল কহিল: আজ্ঞা করুন। তুমি শ্রেষ্ঠ শিল্পী—অপরূপ তোমার নৈপুণ্য—সার্থক তোমার ভাস্কর্য্য শিক্ষা—কিন্তু বৎস এ কিসের প্রতিমা? কি এর অর্থ?

একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া কুণাল কহিল—মূর্ত্তিমতী অন্ধকারের আহ্বান আলোকের প্রতি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ দেখিলেন অধ্যক্ষ—তাহার পর কহিলেন—সুন্দর। সুন্দর!—তমসো মা জ্যোতির্গময়—হে জ্ঞান-সূর্য্য আলোক দাও—সুন্দরকে চিনিবার প্রকৃত দৃষ্টি দান কর—অন্ধকার বিদূরিত হোক—দূর হোক দৃষ্টির জড়তা—মনের আবিলতা। অপরূপ এই প্রার্থনা—অনাদিকাল থেকে অন্ধকারের অন্তর হতে স্বতঃ উৎসারিত। আবারও বলি সার্থক শিক্ষা তোমার কুণাল—তুমিতো শিক্ষার্থী নও তুমি শিক্ষাদানের উপযুক্ত। কম্পিতস্বরে কুণাল কহিল, না প্রভু, আপনার চরণ প্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার আজীবনের স্বপ্ন!

স্মিতহাস্যে অধ্যক্ষের প্রশান্ত মুখচ্ছবি ভরিয়া গেল—কহিলেন তাহাই হৌক—তুমি আমারই ছাত্র কিন্তু বিদ্যাপীঠের শিক্ষার ভার তুমি লও—আমার বয়স হইয়াছে, আমি আর পারি না—তোমার যাহা জানিবার আবশ্যক হইবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও—আমার সাধ্যমত সাহায্য তোমাকে করিব। আজ হইতেই তুমি এই শিক্ষাভার গ্রহণ কর।

আবার অভিবাদন করিয়া কুণাল কহিল—যথা আজ্ঞা প্রভু!

গৌড়ের সম্পদশালী সামন্ত রাজকন্যা পূর্ণিকা। অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী তরুণী। বিলাসলালিতা—রূপগর্ব্বিতা—সংসারের যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু প্রেয় তাহাই রাজকুমারীর প্রার্থিত। অসুন্দরকে সে বিধাতার অভিশাপ বলিয়াই জানে। পিতা তাহার কঠোর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী—ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিশালী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সুগভীর ঘৃণা। রাজকুমারী পূর্ণিকা শিব উপাসিকা। রাজ্যের মধ্যস্থলে শিবের স্বর্ণমন্দির। তাহার শীর্ষ গগনস্পর্শ করিতে চাহে। স্বর্ণত্রিশূলের পরে অস্তগামী সূর্য্যের আলো পড়িয়া যেন জ্যোতি প্রতিফলিত হইতে থাকে। রাজকুমারী পূর্ণিকার একান্ত প্রিয় উপাস্য দেবতা মহাদেবের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি। মন্দিরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে শিবরাত্রির পুণ্যরাত্রে। রাজকন্যা পিতার নিকট প্রার্থনা লইয়া গেল—

পিতা! গৌড়ের শ্রেষ্ঠ ভাস্করের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া চাই দেবাদিদেবের মূর্ত্তি—এমন মূর্ত্তি হইবে যাহার তুলনা মিলিবে না ভারতবর্ষের অন্য কোথাও।

আদরিণী কন্যার প্রার্থনা পূরণের জন্য পিতা ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না। সমগ্র গৌড়ে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল আগামী শিবরাত্রে মহাদেবের মূর্ত্তি চাই—শুভ্র মর্ম্মরে নির্ম্মিত। বিচারে যাহার মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবে তাহার মূর্ত্তিই মন্দিরে যথাবিহিত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করা হইবে সেই শিল্পীকে। সেদিন গৌড়ে ভাস্করের অভাব ছিল না। কলালক্ষ্মীর অযাচিত আশীর্ব্বাদে গৌড় সেদিন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। শিল্পীদের মাঝে সাড়া পড়িয়া গেল—কাহার এমন রাজানুগ্রহ লাভের সৌভাগ্য হইবে।

রাজপুরীর সম্মুখে কলস্রোতা নদী। রঙ্গমতীর স্রোতে সেদিন দুর্ব্বারতা ছিল—ছিল তাহার উদ্দাম গতিভঙ্গী। তাহার জলে প্রতি রাত্রে আলোকমালা সজ্জিত রাজপ্রাসাদের চিত্র প্রতিবিম্বিত হইত। নদীর অপর পাড়ে ছোট ছোট পল্লী। তাহারই একটি ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্রতম গৃহে এক ভাস্করের মনেও সেদিন দুরাশা জাগিল। কতদিন রাত্রে প্রভাতে সন্ধ্যায় সে ওই রাজ-প্রাসাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া নিঃশব্দে প্রহর গণনা করিয়াছে। ক্বচিৎ কখনো হয়তো বা শ্বেত রাজপুরীর অলিন্দে রাজকুমারী

পূর্ণিকার শ্বেত মর্ম্মরময়ী সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া আপন প্রতীক্ষাকে সফলজ্ঞান করিয়া কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। দূর হইতে সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কাছে আপনার হৃদয়কে অঞ্জলি করিয়া দান করিয়াছে—কিন্তু হায় দুরাশা! এমনই সময়ে রাজার ঘোষণা তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। ভাস্কর মুহূর্ত্তে আপন দৈন্য ভুলিয়া গেল। এইতো তাহার ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, যে ঐশ্বর্য্যে তাহার সকল দারিদ্র্য নিমেষে অপসারিত হইয়া যাইবে। সমগ্র গৌড়ে কেহ কি পারিবে তাহার সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে? সে নির্ম্মাণ করিবে মহাদেবের মূর্ত্তি—তারপর একদিন সমগ্র গৌড়ের সকল ভাস্করের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিবে—মহা সমারোহে তাহারই নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ওই স্বর্ণ দেবালয়ে—তারপর? তারপর ঐ প্রাসাদবাসিনী সৌন্দর্য্যময়ী রাজকন্যা—তাহার আরাধ্যা দেবীমূর্ত্তি আপন প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাহাকে জয়মাল্য দান করিবেন। আর কোনও পারিতোষিক সে চাহিবে না—একটি কপর্দ্দক মাত্রও নহে। কেবলমাত্র রাজকন্যা পূর্ণিকার হস্ত হইতে একটিমাত্র পুষ্পমাল্য—যাহাকে সে তাহার উন্নত গর্ব্বিত শিরে পরিবে। কুটিরে ফিরিয়া ভাস্কর আলো জ্বালিল। সম্মুখে স্থাপিত তাহার উপাস্য দেবতা অমিতাভের প্রসন্ন বরাভয় মূর্ত্তি। যুক্ত করে ভাস্কর কহিল হে তথাগত! আমার অন্তরের কামনাকে তুমি জানিয়াছ—তাহাকে

সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবার অবসর তুমি দিয়াছ—তোমাকে প্রণাম করি।

ভাস্কর আহার নিদ্রা ভুলিয়াছে—ভুলিয়াছে রাত্রিদিন—ভুলিয়াছে বাহিরের আলো অন্ধকার। এমন কি দিনান্তে একটিবারও হয়তো বা রাজকুমারী পূর্ণিকার কথাও মনে পড়েনা। কেবলমাত্র প্রতিদিন প্রত্যুষে অমিতাভের মূর্ত্তির পদতলে বসিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে প্রার্থনা করে—প্রার্থনা করে যেন তাহার আরব্ধ কর্ম্ম সার্থক হইয়া উঠে—তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যে সে বিজয়ী হইতে পারে।

দিনে দিনে মাস পূর্ণ হইয়া আসে—একটি একটি করিয়া ছয় মাস অতিবাহিত হয়—অবশেষে দিন আসে যেদিন রাজগৃহে সভা আহ্বান করা হইবে! ভাস্কর সেদিন উঠিয়া দাঁড়ায়, ক্লান্ত দেহে সে বাহিরে আসে। দেখে দাওয়ার পরে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে মালতী। আপনমনে সে একগাছি পুষ্পমাল্য গাঁথিতেছে—ভাস্করকে দেখিয়াই সে কলহাস্যে কহিল—কুণাল তোমার শিবমূর্ত্তি সমাপ্ত হইল ?

কুণাল কহিল, হইয়াছে—তুমি দেখিবে এস।

মাথা দোলাইয়া মালতী কহিল—আমি পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি—ভারী সুন্দর হইয়াছে।

কুণাল চিন্তিত স্বরে কহিল রাজগৃহের অভিমত কিরূপ হইবে কে জানে!

মালতী কহিল তুমিই প্রথম হইবে।

কিরূপে জানিলে ?

আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকের প্রতিমাই দেখিয়া আসিয়াছি—তোমার শিবের মত এমন প্রসন্ন মুখচ্ছবি আর কাহারও হয় নাই। বিশেষ করিয়া কুশধ্বজের মূর্ত্তি যা হইয়াছে।

ব্যগ্রস্বরে কুণাল কহিল, কেমন হইয়াছে? কুশধ্বজের সহিত ভাস্কর্য্য ব্যাপারে তাহার রেষারেষি ছিল—শিল্পী হিসাবে কুশধ্বজের নামের খ্যাতিও ছিল কম নহে। তাই তাহার সম্বন্ধে কুণালের আশঙ্কা একটু ছিলই।

উচ্চহাস্য করিয়া মালতী কহিল, শিবের মূর্ত্তি অপেক্ষা তাহার সাপটা বড় হইয়াছে কুণাল। একটুও ভাল হয় নাই। কুণাল কথা কহিল না। নিজের শিবমূর্ত্তির পানে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল, মালতীও কুটিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কহিল, দেখ তো তোমার সাপটা কেমন সুন্দর, মহাদেবের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া মাথার উপরে ছত্র ধরিয়াছে, ঠিক যেন আধখানা পদ্ম ফুটিয়া আছে মাথার উপরে, ভারী সুন্দর!

কুণালের পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল শোন একটা কথা—রাজকুমারী পূর্ণিকা নিজের হাতে পুষ্পমাল্য গাঁথিতেছেন শিল্পীর কণ্ঠে পরাইবেন বলিয়া। সে মাল্য তো তোমার কণ্ঠেই দুলিবে। তাহার আগেই আমি আমার গাঁথা এই শ্বেত চম্পকের মালা

তোমার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া যাই। বলিয়াই মালাগাছাটি কুণালের কণ্ঠে দোলাইয়া দিয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

কুণাল তাহার কোনো কথাই শুনে নাই। চোখের সম্মুখে তাহার ভাসিতেছিল যেই লাবণ্যময়ী প্রতিমা তাঁহার স্বর্ণ চম্পকের ন্যায় অঙ্গুলী দিয়া মাল্য গাঁথিতেছেন। কি ফুলে? সে কী নাগকেশর? মহাদেবের প্রিয় ফুল—কুণালেরও বটে।

অপরাহ্ন কাল। রাজগৃহের প্রশস্ত পরীক্ষাগারে সারি সারি মর্ম্মর প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক খানিই সুন্দর। প্রত্যেক খানিই অনবদ্য। রাজকুমারী পূর্ণিকা আপনি পরীক্ষা করিতেছেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন কুণালের শিবমূর্ত্তির নিকটে। প্রসন্ন দাক্ষিণ্যভরা আনন—নয়নে অমৃত প্রস্রবন—দক্ষিণ হস্তে বিষভাণ্ড—নীলকণ্ঠের বিষ পান মূর্ত্তি। পূর্ণিকা চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন—চিকের অন্তরালে কুণালের বক্ষ কাঁপিতেছে দুরু দুরু করিয়া। সহসা পূর্ণিকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বীণা নিন্দিত কণ্ঠে রাজাকে কহিলেন—পিতঃ এই প্রতিমাখানিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে। আমি এই প্রতিমাখানিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই।

কন্যার পানে সস্নেহে চাহিয়া নৃপতি কহিলেন—বেশ মা তাহাই হোক। মন্ত্রীর পানে চাহিয়া পূর্ণিকা কহিলেন—কে ইহার শিল্পী? তাঁহাকে আহ্বান করুন।

মন্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে কুণাল অগ্রসর হইয়া আসিল। চারিদিকের দর্শকবৃন্দ উল্লাস ধ্বনি করিয়া উঠিল—কুণালের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে আনন্দে গর্ব্বে অসহ্য সুখের বেদনায়, কম্পিতস্বরে সে কহিল দীন শিল্পীর অভিবাদন গ্রহণ করুন দেবি! পূর্ণিকার হাতে নাগকেশরের মালা তুলিয়া উঠিল—তিনি তাঁহার মরাল গ্রীবা ফিরাইলেন। ক্ষণেকে প্রলয় ঘটিয়া গেল। রাজকুমারীর হস্তস্খলিত হইয়া নাগকেশরের মালা ভুমিতলে পড়িল। ডালিমরাঙা ওষ্ঠে ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত হইল—

এ কে? কি কুশ্রী!

পলকে রাজসভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কুণাল নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কর্ণে অগ্নিশলাকার ন্যায় দুইটি মাত্র কথা বিঁধিতে লাগিল—কি কুশ্রী! কি কুশ্রী!

ইতিমধ্যে শিল্পী কুশধ্বজ অগ্রসর হইয়া আসিল—উত্তেজিত স্বরে কহিল—রাজন্, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—কুণালের নির্ম্মিত এ মূর্ত্তি মহাদেবের নহে—এ বিধর্ম্মী বুদ্ধমূর্ত্তি।

রাজসভা নিস্তব্ধ। কুণাল তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিল—কিছু কহিল না।

রাজা জলদ গম্ভীরস্বরে কহিলেন—তুমি তোমার অভিযোগ প্রমাণ করিতে পার!

বিনীতভাবে কুশধ্বজ কহিল—পারি মহারাজ, কেবল আমি কেন যাহাকে খুসী আপনি প্রশ্ন করিতে পারেন। মহাদেবের মূর্ত্তিতে সাধকদের ধ্যান সম্মত মুদ্রা কই? চাহিয়া দেখুন দেবাদিদেবের বিপুল জটার পরিবর্ত্তে কুঞ্চিত কেশদাম। মস্তকে ও কী সর্পফণা না অর্দ্ধস্ফুট পদ্মকলি? হস্তে ও কী বিষপাত্র না ভিক্ষাভাণ্ড। রুদ্রের নয়নের অগ্নিজ্বালা কোথায়? ও যে ভিখারীর সর্ব্বস্বহারা দৃষ্টি। কুণাল বিধর্ম্মী মহারাজ। সে বৌদ্ধ।

কুণাল তাহার অপমান ভুলিয়া এতক্ষণ তাহার নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তির পানে চাহিয়াছিল আর কুশধ্বজের অভিযোগ শুনিতেছিল। সেও বিস্মিত হইয়াই দেখিতেছিল তাহার কুটিরে তথাগতের চরণতলে বসিয়া যাঁহার মূর্ত্তি সে এত দীর্ঘদিনের সাধনায় রচনা করিয়াছে তাহা শিবের মুর্ত্তি নহে—তাহা অমিতাভের করুণা মূর্ত্তি।

রাজকুমারী পূর্ণিকা এতক্ষণ অপরিসীম ঘৃণা ও বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিলেন। শিল্পীর সেই কুরূপ আকৃতি তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল—এইবার তাঁহার সুন্দর বামপদাঘাতে তিনি কুণালের শিবমূর্ত্তিকে তাঁহার আসনচ্যুত করিয়া ফেলিয়া কহিলেন—অসহ্য স্পর্দ্ধা শিল্পীর!

এতক্ষণের তীব্র অপমানেও যাহা হয় নাই—এইবার তাহাই হইল অপমানিত নত মস্তককে দৃঢ় করিয়া—উন্নত করিয়া—

পূর্ণিকার পদ্মপলাশ চোখের দিকে চাহিয়া শিল্পী কুণাল কহিল—হায় দৃষ্টিহীনা।

পরক্ষণেই ঝড়ের গতিতে বাহির হইয়া গেল সে রাজগৃহ হইতে। বাহিরে আসিয়া দেখিল পায়ে জড়াইয়া আসিয়াছে নাগকেশরের মাল্যগাছি। সবলে তাহাকে পদদলিত করিয়া সে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। বিক্রমশীলার বিদ্যাপীঠ দিনে দিনে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। দলে দলে ছাত্র আসে আবার শিক্ষান্তে তাহারা বিজয় আনন্দে ফিরিয়া যায়। তাহাদের ললাটে জ্ঞানের আলো। চোখে নবজীবনের উৎসাহ। স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ নূতনজীবনগুলি। বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া যায়। একে একে পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কুণালের অধ্যাপক জীবনের পাঁচটি বৎসর। তাহার শিক্ষা নৈপুণ্যে, তাহার সুমধুর ব্যবহারে বিশাল বিদ্যাপীঠের প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক প্রীত। কিন্তু সেই সঙ্গে সকলেরই একই অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে—কুণাল সামাজিক নহে। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে আলাপে কোথায় যেন একটা দূরত্ব রাখিয়া চলে সে। সেখানে তাহার অন্তরঙ্গ কেহ নাই। আর একটি বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—সে ওই রহস্যময়ী মর্ম্মর প্রতিমা। আপন কক্ষে একটি সুন্দর প্রস্তরাসনের পরে সেই

দৃষ্টিহীনা প্রতিমাখানি স্থাপিত—প্রতি প্রভাতে আর সন্ধ্যায় সেখানে কুণালের সেই একই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়—তমসো মা জ্যোতির্গময়! শুধুই কি আলোর জন্যে এই প্রার্থনা। এই বেদনাভরা নিবেদন? এ কী শুধুই রূপক কিংবা উহার সহিত জড়িত আছে কুণালের অতীত জীবনের কোনও অধ্যায়? অসঙ্গত কৌতূহল কেবলই বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু কেহ কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস পায় না। বিশেষ কুণাল অধ্যক্ষের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র—তাহাকে অসন্তুষ্ট করিতে কেহ ভরসা পায় না। কুণালের চারিপাশে অপরিচয়ের গণ্ডী ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়।

সেদিন প্রভাতে কুণাল প্রাতঃস্নান করিয়া বিদ্যাপীঠে ফিরিতেছে। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে একাকী স্নান করিতেই সে ভালবাসে। কোলাহলকে এড়াইবার জন্য তাহার আপ্রাণ চেষ্টা। সিক্তবস্ত্রে বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সে চলিয়াছে—সহসা কাহার আহ্বানে তাহার একাগ্র চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

সে মাথা তুলিয়া চাহিল—দেখিল সম্মুখে কুশধ্বজ। একান্ত নিশ্চিন্তভাবে পথ চলিতে চলিতে সহসা বিষধর সর্প দেখিলে যেমন পথিক চমকিয়া উঠে—তেমনিই চমকিয়া উঠিল কুণাল। বক্রহাস্যে মুখ ভরিয়া কুশধ্বজ কহিল—তুমি এখানেই আছ?

—হাঁ।

কি কর ?

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য অধ্যক্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি।

তবে যে শুনিলাম তুমি শিল্প অধ্যাপক।

ভুল শুনিয়াছ। আমি বিদ্যাপীঠের সামান্য সাহায্যকারী মাত্র।

কুশধ্বজ কহিল—আমি হিন্দু ভাস্কর্য্যের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছি।

কুণাল কহিল—শুনিয়া সুখী হইলাম, আবার সময়ে দেখা হইবে বলিয়া কুণাল পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার গতিপথের দিকে ক্রুরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কুশধ্বজ।

দুইদিন পরে দ্বিপ্রহরে অধ্যক্ষ কুণালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কুণাল আসিলে তাহাকে বসিতে বলিয়া অধ্যক্ষ স্নেহগভীর কণ্ঠে কহিলেন—বৎস! তুমি কি কুশধ্বজকে পূর্ব্বে চিনিতে ?

বিনীত স্বরে কুণাল কহিল—চিনিতাম।

অধ্যক্ষ কহিলেন তুমি তোমার পূর্ব্ব কথা এখনও বল নাই— আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু আমার মনে হয় কুশধ্বজ তোমার অনিষ্ট কামনা করে। সেও শিল্পী—ভাস্কর্য্যে তাহারও যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে—এ ঈর্ষ্যা কি—তাহারই জন্য ?

কুণাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল—

অধ্যক্ষ কহিলেন—পূর্ব্ব কথা স্মরণে যদি এখনও বেদনা জাগে তবে থাক সে কথা—কিন্তু বৎস! ভিক্ষুরতো বেদনা

নাই—কুণাল কহিল—না প্রভু! ভিক্ষুর বেদনা নাই—বেদনা অথবা গ্লানি আমি জয় করিয়াছি—তথাপি এখনও পূর্ব্বাশ্রমের কথা সব ভুলিতে পারি নাই।

সহসা বাক্যের স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া অধ্যক্ষ কহিলেন—পুত্র। তোমার নির্ম্মিত ঐ দৃষ্টিহীনা পাষাণ প্রতিমাকে কি তুমি চিনিতে? কুণাল বহুদিন হইতেই এই প্রশ্নের অপেক্ষা করিতেছিল।

সংযত স্বরে সে কহিল—হাঁ প্রভু! ভালবাসিতাম। আর ভালবাসিতাম বলিয়াই আজিও তাহার জন্য আলোকের প্রার্থনা আমার শেষ হয় নাই। তাহার অপরিসীম অপরাধের মার্জ্জনার জন্য তথাগতের কাছে আমার অনন্তকাল ধরিয়া প্রার্থনা থাকিবে।

একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অধ্যক্ষ কহিলেন—বৎস। যেদিন তোমাকে প্রথমে আশ্রমে দেখিয়াছিলাম—সেদিন তোমার এই বাহিরের রূপকে অতিক্রম করিয়া তোমার অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে দেখিয়াছিলাম তোমার স্বচ্ছ ললাট দর্পণে তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল নয়ন তারকায় প্রতিফলিত জ্যোতি দেখিয়া জানিয়াছিলাম তুমি তথাগতের প্রিয় পুত্র—তাঁহার করুণাশ্রিত। জানিতাম তোমার সৌভাগ্য আপনি তাহার পথ করিয়া লইবে। শুনিয়া থাকিবে গৌড়ের বৌদ্ধ সম্রাটের অনুগ্রহে একদল বাঙ্গালী শিল্পী পূর্ব্বদিকে

বৃহত্তর বঙ্গের ভিত্তি স্থাপন করিতে চলিয়াছেন—তাঁহারা যবদ্বীপ, বালী, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতিতে বাংলার শিল্প স্থাপনার জন্য যাত্রা করিতেছেন। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের এক সুবর্ণ যুগ। আমার ইচ্ছা তুমি এই দলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অগ্রসর হও। বিক্রমশীলার বিদ্যাপীঠের নাম অক্ষয় কর। দেশ পর্য্যটনে তোমার মনের অবসাদ দূর হইবে। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে কুণাল বিহ্বল হইয়া গেল। পরক্ষণেই নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

দক্ষিণ হস্ত তাহার মস্তকে অর্পণ করিয়া অধ্যক্ষ কহিলেন—তথাগত তোমার কল্যাণ করুন বৎস।

দীর্ঘ দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুল দশটী বৎসর। বাংলা দেশের সিংহাসনে তখন পাল-বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি নয়পাল। বাংলাদেশ তখন গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র বাংলা প্রভাবিত। পশ্চিমে পাঞ্জাব হইতে সুদূর যবদ্বীপ পর্য্যন্ত সেই পাল রাজ্যের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের চেদীরাজ কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণে বাংলাদেশ এক প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। বিক্রমশীলা বিদ্যাপীঠের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা সেইদিন সেই রক্ত তাণ্ডবে শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া বাহিরে

আসিল। শত্রু মিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া তাহারা আহতের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিল। ক্রমে যুদ্ধের কোলাহল থামিয়া আসিল। কর্ণরাজকন্যা ভিক্ষুণী যৌবনশ্রীর সহিত নয়পালের বীর পুত্র বিগ্রহপালের বিবাহ হইল—কিন্তু সে ইতিহাসের কাহিনী।

তাহার কথা থাক। বহুদিন পূর্ব্বে ফেলিয়া আসা রঙ্গ-মতীর তীরে আপন কুটীরখানি বৃহত্তর বঙ্গ প্রত্যাগত কুণালের মন টানিতেছিল। জীবনে যশের শ্রেষ্ঠ শিখরে উঠিয়াছে সে। মনে পড়িল তাহার শিল্প নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া সুবর্ণদ্বীপের বৌদ্ধ রাজকন্যা তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল। রূপের দিকে তো সে চাহে নাই—বলে নাই—কি কুশ্রী! কুণালই বরং নিজেকে ভিক্ষু পরিচয় দিয়া সবিনয়ে সে সম্মানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণদ্বীপ রাজকন্যা তো রূপ লাবণ্যে পূর্ণিমা হইতে ন্যূন ছিল না। কিন্তু নিজেকে কশাঘাতে কুণাল সচকিত করিল ভিক্ষুর একী চিন্তাধারা!

রঙ্গমতীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার কুটীরখানি পূর্ব্বের মতই সুন্দর আছে—সযত্ন রক্ষিত ও পরিচ্ছন্ন। অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল এ কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? এমন সময়ে কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিল একটি তরুণী গৈরিকে আবৃত তাহার দেহ, মুণ্ডিত মস্তক। সহসা চিনিতে কষ্ট হইল। পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃত ভাবে ডাকিয়া উঠিল—

মালতি !

কে ? বলিয়া তরুণী ফিরিয়া দাঁড়াইল—কাছে আসিয়া বলিল তুমি ? কুণাল এতদিন পরে ?

কুটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া দুইজনে অনেক কথাই হইল। কুণাল জানিল মালতী বুদ্ধ উপাসিকা। মালতী জানিল কুণালের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। অবশেষে কুণালকে লইয়া কুটীরের ভিতর গিয়া সে দেখাইয়া কহিল—চিনিতে পার কুণাল ?

কুণাল দেখিল দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার রচিত যে পাষাণ প্রতিমাখানি একদিন রাজসভায় উপেক্ষিত হইয়াছিল তাহাকেই মালতী দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিতেছে। কী সুন্দর মূর্ত্তিখানি বিশেষ করিয়া উপাসিকার ভক্তিমন্ত্রে যেন তাহার মাধুর্য্য আরও বাড়িয়াছে। আর ইহাকেই দর্পিতা পূর্ণিকা তাহার বাম পদাঘাতে···কুণাল ভাবিতে পারিল না। শিহরিয়া উঠিল।

মালতী কহিল বাংলার সাম্প্রতিক যুদ্ধে পূর্ণিকার পিতা বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডই হইয়াছিল। এক মহাপুরুষ তাহার প্রাণ ভিক্ষা লইয়া গিয়াছিলেন। পূর্ণিকা কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না।

সেদিন ভগবান তথাগতের কাছে নিরুদ্দিষ্টা হতভাগিনী রাজকন্যা পূর্ণিকার জন্য কুণাল বড় মর্ম্মস্পর্শী ভাবেই প্রার্থনা করিল।

মালতীর কাছে বিদায় লইয়া সে বিক্রমশীলার উদ্দেশে যাত্রা করিল। বারে বারেই মালতীর প্রসন্নস্মিত মুখখানি ভাসিয়া উঠিতেছিল তাহার মনের পটে। কি অপরূপ শান্তিই না পাইয়াছে সে। কুণাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মালতি! তুমি সুখে আছ। সে কহিয়াছিল—তথাগতের উপাসিকা আমি—শান্তিতে আছি কুণাল।

কুণাল ভাবিতে থাকে তেমন শান্তি সে কেন পায় না? সে কি পূর্ণিকার জন্য? কেমন করিয়া এ দুর্ব্বলতা তাহার ঘুচিবে? অধ্যক্ষ কহিয়াছিলেন দেশ পর্য্যটনে অবসাদ কাটিবে—কোথায় অবসাদ মুক্ত হইল সে।

বিক্রমশীলার বিদ্যাপীঠ। অপরাহ্ন কাল। দীর্ঘ দশবৎসর পরে কুণাল আসিল অধ্যক্ষের কাছে। তাঁহার পাশে ও কে! অপরূপ কান্তি সৌম্য সুন্দর দেবতা। কুণাল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। অধ্যক্ষ পরিচয় দিলেন মহাস্থবির অতীশ।

অতীশ! দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান! ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া সুদূর চীন তিব্বতে যাঁহার জ্ঞানসূর্য্যালোক পৌঁছিয়াছে? কুণাল প্রণাম করিল তাহার অন্তরের সকল ভক্তি উজাড় করিয়া।

প্রসন্ন হাসিমুখে অতীশ কহিলেন—কুশলে রাখুন তথাগত।

দীর্ঘদিনের পর্য্যটনের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া যখন ক্লান্ত কুণাল উঠিয়া দাঁড়াইল তখন স্থবির কহিলেন—কুণাল। ক্ষণেক

অপেক্ষা কর। তাহার পর নিজে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কুণাল নতশিরে অতীশের পায়ের নীচে বসিয়া আপন শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য গণনা করিতেছিল। এমন সময়ে অধ্যক্ষ আবার ফিরিলেন—কুণাল মুখ তুলিয়া চাহিল—কিন্তু ও কে? অধ্যক্ষের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে ও কে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর জ্যোৎস্নার মত ম্লান অথচ মহিমাময়—ও কে?

অধ্যক্ষ কহিলেন—চিনিতে পার?

কুণাল কম্পিতস্বরে কহিল—রাজকন্যা পূর্ণিকা।

অধ্যক্ষ কহিলেন—না বৎস, ইনি ভিক্ষুণী পূর্ণিকা।

হতবুদ্ধির ন্যায় কুণাল কহিল—পিতা ক্ষমা করুন। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

অধ্যক্ষ নিজে বসিলেন—পূর্ণিকাও নতশিরে বসিল। তাহার পর অধ্যক্ষ কহিতে লাগিলেন কিভাবে সাম্প্রতিক বিগ্রহে বিক্রমশীলার ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। কী মহৎ প্রচেষ্টা ও অসীম ক্ষমায় অতীশ এই বিরোধের অবসান ঘটান—দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ণিকার পিতা সামন্ত নরপতি বিপক্ষ দলে যোগদান করায় নয়পাল তাঁহার প্রাণদণ্ড দেন। অতীশ তাঁহার প্রাণভিক্ষা করিয়া মুক্তি দেন। পূর্ণিকা এই মহাপুরুষের অনতিক্রমনীয় প্রভাবে গৃহত্যাগ করিয়া সেবাব্রতে

দীক্ষিত হইয়া বিক্রমশীলা বিদ্যাপীঠে যোগ দেয় এবং উপসম্পদা গ্রহণ করে।

নতমস্তকে কুণাল সবকথা শুনিতেছিল। সহসা অধ্যক্ষের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল—অধ্যক্ষ কহিতেছেন—তোমার এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরের তপস্যা ব্যর্থ হয় নাই কুণাল! আলোর আবির্ভাব ঘটিয়াছে পূর্ণিকার অন্তরে। অন্ধকার হইতে তাহাকে তথাগত জ্যোতির রাজ্যে উন্নীত করিয়াছেন।

অধ্যক্ষ কহিলেন—কুণাল—আজ তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের দিন—আজ তোমার ওই প্রস্তরময়ী মুর্ত্তিকে দৃষ্টিদান করার সময় আসিয়াছে। ভিক্ষুণী পূর্ণিকা তাহার বাহিরের দৃষ্টি হারাইয়াছে বটে কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিতে সে আজ তথাগতকে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

চমকিয়া কুণাল কহিল—পূর্ণিকা অন্ধ?

হাঁ কুণাল, মৃদুস্বরে পূর্ণিকা কহিল—যেদিন বাহিরের দৃষ্টি ছিল, সেদিন চিনিতে পারি নাই কি সুন্দর আর কি অসুন্দর—বুঝিতে পারি নাই সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য। তথাগত আমাকে সেই মিথ্যা হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যে আনিয়াছেন আজ আমার চোখে সত্যকারের সৌন্দর্য্য ধরা দিয়াছে। সে সৌন্দর্য্যে আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। আমি ধন্য হইয়াছি কুণাল।

অধ্যক্ষ কহিলেন—আহত সৈন্য পরিচর্য্যা করার সময়ে শত্রু নিক্ষিপ্ত তীরে পূর্ণিকা দৃষ্টিশক্তি হারায়।

সেইখানে সেই অধ্যক্ষ, জ্ঞানসূর্য্য অতীশ আর দৃষ্টিহীনা পূর্ণিকার সম্মুখে বসিয়া শিল্পী কুণাল সেই প্রস্তরময়ী প্রতিমার নয়নে দৃষ্টি আঁকিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল। তাহার হাতের বাটালীর আর বিরাম নাই। অবশেষে রাত্রি প্রভাতের পুণ্যক্ষণে তাহার বাটালী নিস্তব্ধ হইল। প্রস্তরময়ী প্রতিমার চোখে দৃষ্টির আলো ফুটিল। অতীশ কহিলেন—রাত্রি প্রভাতের পুণ্যক্ষণ সমাগত প্রায়। তমসার তীরে ওই জ্যোতির্ম্ময়ের পরম আবির্ভাব। হে ভিক্ষুণী! তোমার নয়নে প্রস্ফুটিত হোক সেই জ্যোতির রেখা—সকল বন্ধনাতীত পরম মুক্ত সেই তথাগতকে তুমি প্রত্যক্ষ কর। ভিক্ষু কুণালের দৃষ্টিদান ব্রত সার্থক হোক।

নতজানু বদ্ধাঞ্জলী পূর্ণিকা কহিল—সমস্ত অন্তর ভরিয়া গিয়াছে অপরূপ আলোক প্রস্রবণে—কোথাও এতটুকু গ্লানি নাই, নাই এতটুকু বেদনা বোধ। পিতা আমি আবার দেখিতে পাইতেছি। তাহার মুদ্রিত নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। অতীশ ধ্যান গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

তমসো মা জ্যোতির্গময়—

অধ্যক্ষ, কুণাল ও পূর্ণিকার কণ্ঠ আসিয়া সেই গভীর উদাত্ত স্বরে মিলিল—

তমসো মা জ্যোতির্গময়।
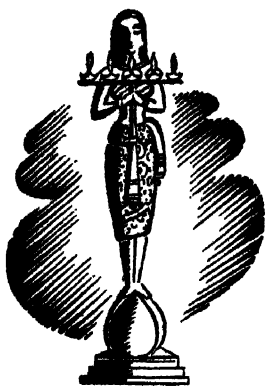
পঞ্চপ্রদীপ

রাজকন্যা সুজাতা বহু কামনার ধন পুত্রলাভ করিয়াছেন। সেদিন তাঁহার মনে পড়িল পুত্রকামনায় বনদেবতাকে চরু উপহার দিবেন মানসিক করিয়াছিলেন। পুত্রের দীর্ঘ-জীবন-কামনায় সুজাতা সেই মানসিক পূর্ণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। লক্ষ গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া দশ সহস্র গাভী—দশ সহস্র গাভীর দুগ্ধজাত খাদ্য আহার করিয়া এক সহস্র গাভী—এক সহস্রের দুগ্ধে লালিত একশত—তারপর দশটী তারপর মাত্র একটী—এবং সেইটিই নাকি কামধেনু—গো-পালক পিতার আদরিণী কন্যা সুজাতা সেই পরম দুর্লভ কামধেনুর দুগ্ধে পরমান্ন রন্ধন করিলেন আপন সুনিপুণ হস্তে। তাহার পর শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্রে দেহ সজ্জিত করিয়া আপন হস্তে সেই অর্ঘ্য বহন করিয়া নৈরঞ্জনা বনে আসিয়াছিলেন বনদেবতাকে নিবেদন করিবার জন্য। সঙ্গে আসিয়াছিল প্রিয়সখী পূজা-উপচার বহন করিয়া। সেদিন বৈশাখী-পূর্ণিমা তিথি। নৈরঞ্জনা

তীরে কোন যোগোত্থিত মহামানবকে সে চরু নিবেদন করিয়া রাজকন্যা পুত্রবতী সুজাতা ধন্য হইয়াছিলেন—সেই মহামানব সেই চরু আহার করিয়া বুদ্ধত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, সে কাহিনী এখানে বর্ণনার প্রয়োজন নাই। রাজকন্যা পূজা সমাপন করিয়া ফিরিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থ আহার্য্য গ্রহণ করিয়া বোধিদ্রুমের তলে তপস্যায় বসিলেন। সুজাতার পূজা-উপচারের ভিতরে ছিল একখানি স্বর্ণপ্রদীপ একটি দীর্ঘ প্রদীপদানের পরে। সেখানি আপন মনে জ্বলিতে জ্বলিতে সিদ্ধার্থের তপস্যা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। পূর্ণঘৃতে নিষিক্ত প্রদীপটী এইভাবে রাত্রির মধ্যযাম পর্য্যন্ত জ্বলিল। তখন সহসা সিদ্ধার্থ তাঁহার যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপূর্ব্ব জ্ঞানে উদ্ভাসিত সে সুন্দর মুখ—আপন মনেই তিনি শান্তকণ্ঠে কহিলেন—পাইয়াছি—মানবদুঃখের পরম মুক্তির পথ আমার জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়াছে। ত্যাগের পথে যে শান্তি—বৈরাগ্যের পথে যে আনন্দ—বাসনালোপের মধ্যে যে পরম নির্ব্বাণ তাহাই আমি দুঃখপীড়িত জীবনের জন্য লাভ করিয়াছি—আমি বুদ্ধ—আমি জ্ঞানী। সেদিন জগতের সেই পরম সন্ধিক্ষণে সেই পুণ্যাত্মার মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের পানে অনিমিষ-নয়নে পূর্ণচন্দ্র চাহিয়াছিল—তাহার রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাধারা তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদের মত ঝরিতেছিল—আকাশবাতাস

মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সেই বুদ্ধত্বলাভে। আর ক্ষুদ্র একখানি স্বর্ণপ্রদীপের অনির্ব্বাণ শিখা অবাক্ বিস্ময়ে সেই যুগাবতারকে প্রত্যক্ষ করিয়া অফুরান পুলকে কাঁপিতেছিল। আপন ক্ষুদ্র প্রদীপশিখার কম্পিত রেখায় রেখায় সেই মহা-মানবকে আহ্বান জানাইয়াছিল। তারপরে কখন প্রভাত আসিল—পূর্ণচন্দ্র পশ্চিমে হেলিল—পূর্ণকাম সিদ্ধার্থ তাঁহার পঞ্চশিষ্যকে দীক্ষাদানমানসে সারনাথ যাত্রা করিলেন। সমস্ত রজনী অনির্ব্বাণ জাগিয়া ক্লান্ত প্রদীপ কখন আঁখি বন্ধ করিয়াছিল—আর তাহার বক্ষে সে পুণ্য আলোক জ্বলিল না। তাহার পর অনাবৃত আকাশের নীচে জলে ঝড়ে রৌদ্রে প্রদীপের স্বর্ণকান্তি মলিন হইয়া গেল। অবশেষে কোন এক সময়ে কোন বনচারী কাঠুরিয়ার চোখে পড়িল, সে সন্তর্পণে এদিক ওদিক চাহিয়া প্রদীপ ও প্রদীপদানখানি লইয়া দ্রুত-গতিতে পলায়ন করিল।

* * *

প্রায় সহস্র বৎসর পরের কাহিনী। বৌদ্ধধর্ম্মের পুণ্যপ্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপতির হাতের অসি খসিয়াছে—আসিয়াছে ভিক্ষাপাত্র—রাজদণ্ড শ্লথ হইয়া মুষ্টিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—উঠিয়াছে ভিক্ষুর দণ্ড—নগ্ন মুণ্ডিত মস্তকে আর রাজকিরীট শোভা পায় না। ভিক্ষুর গৈরিক

বেশে, সজ্জিত নৃপতির বরতনু। সেই মহান্ দৃষ্টান্তে রাজপুরবাসীরাও ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়াছে—হিংসাদ্বেষের অবসান ঘটিয়াছে সর্ব্বত্র—বৈরাগীর গেরুয়ার রঙে সকলের মনে আসিয়াছে বিবাগীর উদাসীনতা।

মগধের উপান্তে অম্বাপালীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। যখন বৌদ্ধ নৃপতি সর্ব্বতোভাবেই শক্তির উপাসক ছিলেন—বাসনাত্যাগ নহে—ভোগই ছিল পরম এবং চরম কথা—তখন অম্বাপালী ছিল রাজনটী। তরুণী অম্বাপালীর সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্যের জোয়ার—কণ্ঠে, চক্ষে, বক্ষে, বাহুতে তাহার অপরূপ লীলা-সৌন্দর্য্য—চারুকলায় তাহার অসাধারণ অধিকার। তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে, চোখের ইঙ্গিতে সে একদা স্বয়ং মগধেশ্বরকেও পরিচালিত করিত। মগধেশ্বর তাঁহার বিশাল ও বিপুল সাম্রাজ্যের মণিমাণিক্যে অম্বাপালীকে সাজাইয়াছিলেন। তাহারই কটাক্ষের আঘাতে সেদিন বড় বড় শ্রেষ্ঠীদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন ঘটিত। কিন্তু সে আগের কাহিনী। অম্বার মনে হয়—হয়তো বা পূর্ব্বজন্মের স্বপ্ন। তাহার একান্ত অনুগ্রহপ্রার্থী সম্রাট আজ আর ভ্রমেও অম্বার প্রাসাদে পদার্পণ করেন না। অম্বাপেক্ষাও কোন মোহিনীর আকর্ষণে তিনি আজ সর্ব্বস্বত্যাগের সর্ব্বনাশা খেলায় মাতিয়াছেন। একি অদ্ভুত খেয়াল! একি অবিশ্বাস্য নেশা! কি মন্ত্রে মানুষ এমন করিয়া জীবনের সকল আনন্দ, সব উৎসব বিসর্জ্জন

করিতে পারে তাহা এই সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা ঐশ্বর্য্যে লালিতা বিলাসময়ী তরুণীর উপলব্ধির বাহিরে। সম্রাটের উপসম্পদা গ্রহণের আগে সম্রাট তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা অম্বাপালীকে জানাইয়াছিলেন—রক্ত-স্রোত-বিহ্বল বেদনার্ত্ত সম্রাট অম্বাকে কহিয়াছিলেন—অম্বা তুমিও এই শান্তধর্ম্মের স্মরণ লও—জীবনের ভোগ-বিলাস-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের ব্রত গ্রহণ কর—সার্থকতার পথ খুঁজিয়া পাইবে। ভোগবিলাসসর্ব্বস্বা রমণী সেদিন উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিয়াছিল—তোমার ঐ শুষ্কধর্ম্ম আমাকে কি দিতে পারে? উপবাস আমার ধর্ম্ম নহে—তাহা হইলে ভগবান মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করিতেন না। বিবাগী সম্রাট সেদিন আর কিছু কহেন নাই।

অম্বাপালীর আপন রূপ-ঐশ্বর্য্যে প্রবল আস্থা ছিল। সম্রাট যে সত্যসত্যই তাহার আকর্ষণ কাটাইতে পারিবেন এ বিশ্বাস তাহার ছিল না। শুষ্ক গৈরিক ধর্ম্ম এমন কি দিতে পারে—তাই সেদিন সেই গর্ব্বিতা রূপসীর বঙ্কিম ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপের ব্যঙ্গহাসিও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে, দিনে দিনে তাহার সেই অহঙ্কার চুর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সম্রাট আর তাহার সেই প্রাসাদে আসেন নাই—আর তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত নেন নাই। এমন কি আপন মর্যাদা ও অভিমানকে একপাশে বসাইয়া রাখিয়া অম্বাপালী সম্রাটের কাছে আপন পরিচারিকাকেও

প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হইয়াই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার পর বাকী ছিল প্রতিহিংসার পালা। ব্যর্থ ক্ষোভে সর্ব্বনাশী সেই পথই বাছিয়া লইয়াছে। আপন অসীম শক্তিশালী সৌন্দর্য্যকে আশ্রয় করিয়া সে বৌদ্ধধর্ম্মে আঘাত করিতে উদ্যতা। যে ধর্ম্ম তাহার সকল ঐশ্বর্য্য, গর্ব্ব, অহঙ্কার, সুখ, আনন্দকে অপহরণ করিয়াছে—নির্ম্মম প্রতিহিংসায় সে তাহাকে চূর্ণ করিয়া দিবে ইহাই তাহার পণ। ফলও ফলিতে সুরু করিয়াছে। রাজপুরীর অন্য প্রান্তে অবস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘে অম্বাপালীর কার্য্যের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সৌম্যমূর্ত্তি যে সকল সুকুমার তরুণেরা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসারের মোহজাল হইতে মুক্তি পাইবার আশায় সমবেত হইয়াছে সঙ্ঘে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই অম্বাপালীর আকর্ষণে ধরা পড়িতে লাগিল। নীরস বৌদ্ধসঙ্ঘ অপেক্ষা সঙ্গীতবাদ্যমুখরিত অম্বাপালীর প্রাসাদই তাহাদের কাছে অধিকতর বাস্তব এবং সেইজন্যই অধিকতর শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ফলে সঙ্ঘারামের শুচিতা—তাহার সংযম, তাহার পবিত্রতা বিপন্ন হইয়া উঠিল। সঙ্ঘস্থবির অবশেষে সম্রাটের শরণাপন্ন হইলেন। সম্রাট অম্বাপালীকে এই সাংঘাতিক খেলা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বার্ত্তা পাঠাইলেন। আজ অম্বাপালীর মহাবিজয়ের দিন—সে তীব্র হাস্যে বার্ত্তাবহকে বলিয়া পাঠাইল,

সম্রাটের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, সে তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থিনী নহে—সে তাঁহার আজ্ঞাবাহিকা নহে।

বার্ত্তাবহ সবিনয়ে কহিয়াছিল—সম্রাটের আজ্ঞা অবশ্য শিরোধার্য্য।

অম্বাপালী সব্যঙ্গে কহিয়াছিল—যে হতভাগ্য সম্রাট রাজদণ্ডের পরিবর্ত্তে ভিক্ষুকের দণ্ড আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাকে অম্বাপালী সম্রাট বলিয়া গণ্য করে না।

সম্রাট ইহার পরে এখন পর্য্যন্তও আর কিছু করেন নাই, হয়তো বা কিরূপে এই দুর্ব্বিনীতাকে কঠোরতর শাস্তি দান করা যায় তাহাই ভাবিতেছিলেন। আর মহাস্থবির অপেক্ষা করিতেছিলেন—কখন কোন্ শুভমুহূর্ত্তে মহাকারুণিক এই পতিতা নারীকে শুভবুদ্ধি দান করিবেন। এমনই সময়ে অবস্থা চরমে দাঁড়াইল। সঙ্ঘস্থবিরের পরম প্রিয় পাত্র ভিক্ষু ক্ষেমঙ্কর। সুদর্শন যুবক—শান্ত, প্রসন্ন মুখশ্রী। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাহার বংশের আভিজাত্য নীরবেই আপনাকে প্রকাশ করে—তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহ জানে না—কেবলমাত্র জানেন সঙ্ঘস্থবির—কিসের দুঃখে সে সংসারে বীতরাগ হইয়াছিল কে জানে—কিন্তু তাহার ললাটে, তাহার নেত্রে, তাহার দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে প্রতিভা ও বীরত্বের যে বিচিত্র আভা খেলা করিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাহার সেই দীর্ঘ সুঠাম দেহে গৈরিক বড়

বেশী মানাইত না—মনে হইত সেই উন্নত ললাটে রাজকিরীট বেশী শোভা পাইত—বলিষ্ঠ হাতে ভিক্ষাপাত্র অপেক্ষা অসির দাবী যেন ছিল বেশী। কিন্তু সে অন্য কথা—ভিক্ষু হিসাবে ক্ষেমঙ্করের সুনাম ও সুযশ সমস্ত মগধে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তার প্রসন্ন নত নয়নে আনন্দের আভা—তার সর্ব্বাঙ্গে সার্থকতার জ্যোতি—যখন সে পুর দ্বারে দ্বারে বৌদ্ধ-স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা চাহিত, তখন তাহার পানে চাহিয়া গৃহস্থের প্রাণে শান্তি আসিত। সঙ্ঘস্থবিরের সে পরম প্রিয়পাত্র—সঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারী। সমপর্য্যায়ভুক্ত বৌদ্ধ শ্রমণদের মধ্যে তাহার অসীম প্রতিপত্তি। ক্ষেমঙ্কর তাহাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

সেদিন তথাগত বুদ্ধের সঙ্ঘে উৎসব—বাৎসরিক দীক্ষার দিবস—সঙ্ঘস্থবির নানা কারণে এইবার স্বয়ং দীক্ষা দিতে অপারগ—তিনি অসুস্থ—সেই কারণে ক্ষেমঙ্করের পরেই এবার পড়িয়াছে নবাগত শ্রমণদের উপসম্পদা-দানের পবিত্র ভার। এই পুণ্য দায়িত্বে ক্ষেমঙ্করের মনে এক অননুভূত আনন্দ ও আবেগের সঞ্চার হইতেছে—সেদিন তাই অতি প্রত্যুষে সে পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল—তখনও রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় নাই—অন্ধকারে জলকল্লোলধ্বনি তাহার কানে আসিতেছে—ভগবান বুদ্ধের পবিত্র

নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষেমঙ্কর সোপান বাহিয়া নামিতে লাগিল—এমন সময়ে সহসা লঘুপদশব্দে ক্ষেমঙ্করের চমক ভাঙ্গিল···নতমুখী একটী নারীমূর্ত্তি স্নান সমাপ্ত করিয়া উপরে উঠিতেছে—নত নেত্রেই ক্ষেমঙ্কর পথ ছাড়িয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু চিরন্তন কৌতূহলী নারীমন চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিল—তারপরেই অস্ফুট আর্ত্তস্বরে সে কহিল—কে তুমি ?

সেই কণ্ঠস্বরে প্রভাতের নিদ্রা বুঝি চকিত হইয়া উঠিল—ক্ষেমঙ্করও চমকিয়া উঠিল সেই পরিচিত স্বরে—তবু মানসিক সংযমে সবলে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া নতনেত্রেই কহিল—ভিক্ষু ক্ষেমঙ্কর !

রমণী ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছে—কম্পিত কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের বেদনা ও ক্রোধ ঝরিয়া পড়িতেছিল, কহিল—মিথ্যা কথা– তুমি শ্রেষ্ঠীপুত্র সুদর্শন—

ক্ষেমঙ্করের সযত্নপোষিত সংযম আর বাঁধ মানিল না রমণীর মুখপানে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া কহিল—তুমি কে ?

এতক্ষণে প্রভাতের আলো ফুটিয়াছে—রমণীর উন্নীত মুখমণ্ডলের পরে প্রথম আলোকরেখা আসিয়া পড়িয়াছে—সেই অশ্রুভারাক্রান্ত গভীর কৃষ্ণনয়নের পানে চাহিয়া ক্ষেমঙ্কর কহিল, বিশাখা ! তুমি কোথা হইতে আসিলে ?

রমণীর আঁখির অশ্রু শুকাইয়া গেল—জাগিয়া উঠিল জ্বালাভরা বিদ্যুৎ গর্ব্বিতভাবে গ্রীবা ফিরাইয়া সে কহিল, আমিও বিশাখা নহি আমি অম্বাপালী। তাহার পরে দৃঢ় পদক্ষেপে সোপান বাহিয়া উঠিয়া গেল। ক্ষেমঙ্কর শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে আপন শ্রবণদ্বয় আবৃত করিল। উত্তপ্ত লৌহশলাকা কেহ যেন তাহাতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে।

বেলা বাড়িয়া গেল বৌদ্ধসঙ্ঘে দীক্ষার জন্য নবভিক্ষুর দল আসিয়া উপস্থিত হইল ক্ষেমঙ্করের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল কিন্তু কোথাও সেই সদাপ্রসন্ন, শান্ত, সৌম্য ভিক্ষুকে দেখা গেল না। সঙ্ঘস্থবির নিজেই কোনও ক্রমে দীক্ষা সমাপ্ত করিলেন।

নগরের বাহিরে আম্রবনের ছায়ায় বসিয়া ক্ষেমঙ্কর ভাবিতে-ছিল প্রায় দশ বৎসর আগের কথা। ধনবান শ্রেষ্ঠী মণিদত্তের প্রাসাদতুল্য গৃহে সেদিন উৎসবের সাড়া পড়িয়াছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র সুদর্শনের বিবাহ। উৎসব-আনন্দে কোন কিছুরই অভাব ছিল না ছিল অভাব কেবলমাত্র সুদর্শনের সম্মতির। বিলাসভোগে বীতস্পৃহ কুমার বিবাহের স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে চাহে নাই রাজপুরীর সঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য তাহার সমগ্র মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে বিবাহে পরিপূর্ণভাবেই অসম্মতি জানাইয়াছিল। কিন্তু পিতা মণিদত্ত তাঁহার সমস্ত

জীবনের ঐশ্বর্য্য ও উপার্জ্জনের প্রভূত সম্পত্তি ভিক্ষুসঙ্ঘে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না কাজেই পুত্রের আপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুকন্যা রূপসী তরুণী বিশাখার সহিত সুদর্শনের বিবাহ দিলেন। বিশাখার সহিত সুদর্শনের বাল্যকাল হইতেই পরিচয় ছিল। হয়তো উভয়ের মধ্যে কিছুটা অনুরাগও ছিল। কিন্তু যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া গেল। সুদর্শন যেমন ভোগবিলাসহীন বৌদ্ধ সঙ্ঘকে জীবনের একমাত্র আদর্শ ও আশ্রয় স্থির করিয়া লইল, বিশাখা তেমনই ভালবাসিল জীবনের পার্থিব সুখ ও ঐশ্বর্য্যকে। আপনার অপরূপ রূপলাবণ্যকে সে ভালবাসিত—ভালবাসিত অনবদ্য-ভাবে নিজে সাজিতে—অপরের সপ্রশংস দৃষ্টি তাহাকে পরম তৃপ্তি দান করিত। পুত্রের সংসারবিরাগী মনকে বাঁধিবার জন্য এমনই একটী রূপলাবণ্যময়ী বিলাসসর্ব্বস্বা কন্যাকে মণিদত্ত বধূরূপে বরণ করিয়া ভাবিলেন, এইবার পুত্রের মন ফিরিবে। কিন্তু বৃথাই সুদর্শনের মন ফিরিল না পত্নীকে ভালবাসিয়া কাছে ডাকিয়া সংসারের এই অপ্রয়োজনীয় ভোগস্পৃহাকে জয় করিবার উপদেশ দিল ভগবান বুদ্ধের জীবনী তাহাকে কতভাবে বর্ণনা করিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রূপসী বিলাসী তরুণী পত্নী স্বামীর কঠোর জীবনব্রতকে উপলব্ধি করিতে চাহিল না বা পারিল না। স্বামীকে গভীর ঘৃণা ও উপেক্ষার সঙ্গে

সে পরিহার করিয়া চলিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী মণিদত্ত বধূর বিলাসিতার প্রশ্রয় দিয়া পুত্র ও বধূর মনোমালিন্যে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। অবশেষে সুদর্শনের অসহ্য হইয়া উঠিল। গৃহের কোলাহল তাহাকে প্রতিনিয়তই বেদনা দান করিতে লাগিল। অবশেষে এক রাত্রে সে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল পিতা ও পত্নীর পরে গভীর অভিমানে ও মনোবেদনায় সে চিরদিনের জন্য হারাইয়া গেল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্রগুলি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে রাজগৃহে আসিয়া সঙ্ঘস্থবিরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিল। পূর্ব্ব জীবনকে সে ভুলিতেই চাহিয়াছিল হয়তো বা ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু এ-কী নিদারুণ সত্যের মধ্যে বেদনাময় জাগরণ! ক্ষেমঙ্কর প্রাণপণে সব ভুলিতে চাহিল—পারিল কই? কেবলই বিশাখার মুখখানি কেন মনে পড়ে? চঞ্চলা অস্থিরবুদ্ধি সেই বালিকার এ-কী সর্ব্বনাশা পরিণতি? ইহার অপেক্ষা সে মরিয়া গেল না কেন? ক্ষেমঙ্কর শিহরিয়া উঠিল—ছি ছি, একি সে ভাবিতেছে? কল্যাণময় তথাগতের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে—কাহার ভিতরে কি ভাবে তাঁহার প্রকাশ তাহা কে বলিতে পারে? ক্ষেমঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল—সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়াছেন—এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটিবারও সঙ্ঘের কথা তাহার মনে আসে নাই—কেবলই যে বিশাখার কথা ভাবিয়াছে—তাহার চিত্ত অশুদ্ধ হইয়াছে—গভীর

মর্ম্মবেদনা ও অনুতাপে তখন তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। বিষাদাচ্ছন্ন চিত্তে সে নগরীর দিকে পা বাড়াইল। সঙ্ঘের দ্বারে যখন সে আসিয়া পৌঁছিল তখন গভীর রাত্রি অপরাধীর ন্যায় সঙ্ঘে যখন সে প্রবেশ করিল তখন তাহার মনে পড়িল আজিকার দীক্ষাদানের ভার তাহার উপরে ছিল। অসুস্থ স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কি কৈফিয়ৎ সে দিবে তাহার কর্ত্তব্যের অবহেলার—সমস্ত দিন সঙ্ঘে অনুপস্থিত থাকিবার ? স্থবিরের কাছে উপস্থিত হইতে ক্ষেমঙ্কর এই প্রথম দ্বিধা বোধ করিল ভাবিল—কাল প্রভাতে দেখা করিব—আজ নয়। ভিক্ষুর মানসিক শক্তি ও সাহস কেন সে হারাইল তাহা নিজেও বুঝিতে পারিতেছিল না।

পরদিন প্রত্যুষে সারারাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করার পর যখন ক্ষেমঙ্কর বাহিরের উদ্যানে আসিল তখন স্থবির স্নান সমাপন করিয়া উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছেন অস্নাত জাগরণ-ক্লান্ত ক্ষেমঙ্করের অপরাধ মলিন মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। কোনও প্রশ্ন করিলেন না নত হইয়া প্রণাম করিয়া ক্ষেমঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল প্রসন্ন প্রশান্ত স্বরে স্থবির কহিলেন তথাগত তেমার মঙ্গল করুন। যাও স্নান করিয়া আইস ঊষা-প্রার্থনার আর দেরী নাই। বুদ্ধস্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি পুনরায় পুষ্পচয়নে মনোনিবেশ করিলেন

গত দিনের কথার উল্লেখমাত্র করিলেন না। লজ্জিত বেদনাহত ক্ষেমঙ্কর স্নান করিতে গেল। ভাবিয়াছিল স্থবির প্রশ্ন করিলে সকল কথা বলিয়া সে গ্লানিমুক্ত হইবে কিন্তু উপযাচক হইয়া কেমন করিয়া এমন কথা বলা চলে ?

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল ভিক্ষু ক্ষেমঙ্করের মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অম্বাপালী দুইদিন তাহার বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে ক্ষেমঙ্করের কাছে পাঠাইয়াছে। ক্ষেমঙ্করকে অনেক করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছে একটিবারের জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। ক্ষেমঙ্কর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু অম্বাপালীর এই আহ্বান সঙ্ঘে অজানা নাই। প্রথমে বিস্ময়, পরে ঘৃণার একটা স্পষ্ট প্রকাশ বৌদ্ধশ্রমণদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, অনেকেই ক্ষেমঙ্করের প্রতিপত্তি ও তাহার প্রতি স্থবিরের স্নেহাধিক্যে একটু ঈর্ষান্বিত ছিল, আজ সামান্যতম সুযোগেই তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। ক্ষেমঙ্কর কাহাকেও কিছু বলিল না কোনও প্রতিবাদ করিল না, কেবলমাত্র প্রতীক্ষা করিতে লাগিল কখন স্থবির তাহাকে সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করিবেন। তাহাতেই বা কি আসে যায় ? সে ভিক্ষুর আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে। অম্বাপালীর আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বটে কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। তাহার অপরূপ রূপশ্রী তাহাকে অভিভূত করিয়াছে, তাহার চিত্তের স্থৈর্য্যকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই সঙ্গে

নিজেকে আত্মগ্লানি হইতে বাঁচাইবার একটা সূক্ষ্ম ও কৌশলপূর্ণ চেষ্টা চলিতেছে মন কহিতেছে তোমারই বিবাহিতা পত্নী, তাহার এই অধঃপতনের জন্য দায়িত্ব তোমারওতো কম নহে। সেদিন সেই নির্ব্বোধ বালিকাকে অমন করিয়া ত্যাগ করিয়া না আসিলে তো আজ সে এমন করিয়া বিপথগামিনী হইতে পারিত না। তাহাকে এই পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার করিবার কোনও দায়িত্বই কি তাহার নাই। তাহার কি একবার অম্বাপালীর কাছে যাওয়া প্রয়োজন নহে? তখনই বৌদ্ধভিক্ষুর শুভবুদ্ধি তাহার অবচেতন মনের নির্লজ্জতাকে তীব্র কশাঘাতে সচেতন করিয়া তুলিয়া কহিতেছে অম্বাপালীর আত্মার অবনতি অপেক্ষা তাহার রূপলাবণ্যই তোমাকে টানিতেছে বেশী। এইভাবে ক্রমাগত মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া ক্ষেমঙ্কর ক্লান্ত হইয়া প্রলোভনের কাছে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিল অম্বাপালীকে সংবাদ পাঠাইল রজনীতে সে অম্বাপালীর গৃহে আসিবে।

অম্বাপালী প্রসাধন করিতেছিল। বস্ত্র অলঙ্কারে তাহার বরতনু ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, ওষ্ঠাধরে খেলা করিতেছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গহাসি। যে ধর্ম্মের প্রেরণায় তাহার স্বামী একদিন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল যে ধর্ম্মের উম্মাদনায় তাহার একান্ত অনুগ্রহভাজন সম্রাট তাহাকে বারংবার

অপমানিতা করিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন আজ সেই ধর্ম্মের চরম পরাজয় তাহার রূপলাবণ্যের কাছে তাহার ঐশ্বর্য্যবিলাসের কাছে।

বৃহৎ স্বর্ণমুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অম্বাপালী তাহার রূপলাবণ্যের পরীক্ষা লইতেছিল সুনিপুণভাবে, এমনই সময়ে প্রিয় পরিচারিকা আসিয়া কহিল, শয়ন কক্ষের স্ফটিকের সহস্রঝাড় বাতিদানটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নূতন কি ব্যবস্থা করিবে। ঈষৎ তপ্তস্বরে অম্বাপালী কহিল—বাতিদান ভাঙ্গিবার দিন আর পাইলি না! এখন ঐরূপ সুন্দর মূল্যবান জিনিষ পাই কোথায়? ভয়ে ভয়ে পরিচারিকা কহিল—স্ফটিক-বাতিদান আর নাই বটে তবে একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণ পঞ্চপ্রদীপ আছে, তাহাতে কাজ চলিতে পারে। কৌতূহলী হইয়া অম্বাপালী প্রদীপদানটি আনিতে আদেশ করিল। প্রদীপ আসিল, সুবৃহৎ পঞ্চপ্রদীপটি একটি পদ্মকোরকের পরে স্থাপিত—বাতিদানের নিম্নে একটি নারী উপাসিকার মূর্ত্তি, তাহারই যুক্ত করে আবদ্ধ বাতিদানের দণ্ডটি। সব মিলাইয়া দেখিতে ভারী সুন্দর। ঈষৎ হাসিয়া অম্বাপালী কহিল—সুন্দর বাতিদানটি, কিন্তু এমন জিনিষটি পাইলে কোথায়?

পরিচারিকা কহিল—শ্রেষ্ঠী মণিদত্তের ভাণ্ডারের এটি একটি বিশেষ সংগ্রহ। শোনা যায়, ভগবান বুদ্ধকে নাকি সুজাতা

এই পঞ্চপ্রদীপে আরতি করিয়া পরমান্ন নিবেদন করিয়াছিলেন। তাহার পর হাত বদল হইতে হইতে অবশেষে মণিদত্তের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অম্বাপালী উচ্চ মধুরকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—ভালই হইয়াছে সঙ্ঘনায়ক ক্ষেমঙ্কর বুদ্ধ উপাসিকার এমন একটি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দেখিয়া সুখীই হইবেন। উত্তম করিয়া বাতিদানটিকে মার্জ্জনা কর, তাহার পরে সুগন্ধি তৈলে পঞ্চপ্রদীপটি জ্বালিবার ব্যবস্থা কর। প্রদীপদান লইয়া পরিচারিকাটি চলিয়া গেল, তবে তাহার মনটা বিশেষ প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। ভগবান বুদ্ধের পূজাউপচার এমন অশ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা তাহার মনঃপূত হইল না।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে। সুন্দররূপে সজ্জিত কক্ষে সুগন্ধি তৈলে স্বর্ণ পঞ্চপ্রদীপ উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। স্বর্ণ পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িতভাবে অম্বাপালী ভাবিতেছিল—ভাবিতেছিল ক্ষেমঙ্করকে নহে—সম্রাটকে নহে—ভাবিতেছিল বহু শতবর্ষ পূর্ব্বের এক স্মরণীয় ঘটনাকে। প্রদীপশিখার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—ইহা কি সত্য যে এই প্রদীপ লইয়া সুজাতা আসিয়াছিল বুদ্ধত্বকামী গৌতমকে পূজা নিবেদন করিতে? এই প্রদীপের শিখা কি তবে সেই লোকবর্ণিত মহাপুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? একটুখানি করুণার হাসি অম্বাপালীর ওষ্ঠে দেখা দিল। হায়রে জড় পদার্থ! যাঁহার বাণী শুনিয়া

লোক পাগল হইয়া সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যায়, তুমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলে অথচ ঠিক তেমনই আছ। তোমার যে প্রদীপশিখায় একদিন ভারতের এক লোকোত্তর পুরুষকে আরতি করিয়াছিলে, আজ তোমার সেই প্রদীপশিখাই অনির্ব্বাণ ও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে এক পতিতা নারীর বিলাস কক্ষে। সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল অম্বাপালী। বাতাসহীন কক্ষে প্রদীপশিখা অমন করিয়া কাঁপিতেছে কেন? প্রদীপের বক্ষ তৈলপূর্ণ, তবু কেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে? অম্বাপালী বিস্মিত হইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল—প্রদীপশিখা একই ভাবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছায়া রচনা করিতেছে। বহুক্ষণ গেল, বিশ্বসংসার ভুলিয়া অম্বা সেই কম্পিত শিখাগুলির পানে চাহিয়া রহিল। একই ভাবে তখন হইতে কাঁপিতেছে শিখা। অবশেষে বহুক্ষণ পরে সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার অক্ষরে লিখিত বাণী অম্বাপালীর নয়নে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া লিখিতেছে—পাইয়াছি—মানবদুঃখের পরম মুক্তির পথ আমার জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়াছে। ত্যাগের পথে যে শান্তি—বৈরাগ্যের পথে যে আনন্দ—বাসনা-লোপের মধ্যে যে পরম নির্ব্বাণ তাহাই আমি দুঃখপীড়িতা ধরণীর জন্য লাভ করিয়াছি। আমি বুদ্ধ—আমি জ্ঞানী। বারংবার সেই বাণী অগ্নির অক্ষরে লিখিত হইতেছে—আবার আপনিই তাহা

মুছিতেছে, আবার নূতন করিয়া রচিত হইতেছে। অম্বাপালী সেই বাণী পাঠ করিতে লাগিল—প্রথমে মনে মনে, তাহার পর মৃদুস্বরে অবশেষে পরিষ্কার কণ্ঠে সে উচ্চারণ করিতে লাগিল প্রদীপের লেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকোত্তর মহামানবের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির প্রথম উক্তি। কহিতে লাগিল—ত্যাগের পথে যে শান্তি—বৈরাগ্যের পথে যে আনন্দ, বাসনা-লোপের মধ্যে যে পরম নির্ব্বাণ তাহাই আমি দুঃখপীড়িতা ধরণীর জন্য লাভ করিয়াছি। কখন পালঙ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া অম্বাপালী ধূলায় নতজানু হইয়া আসন লইয়াছে—

প্রদীপের শিখার পানে চাহিয়া ঊর্দ্ধমুখী পুষ্পের ন্যায় সেও সেই বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহার আয়ত কৃষ্ণনেত্র হইতে অবিশ্রামভাবে ঝরিতে লাগিল অশ্রু, রূপগর্ব্বিতা বিলাস-প্রিয়া অম্বাপালীর জীবনে প্রথম বেদনার অশ্রুজল।

*　　　*　　　*

রাত্রি গভীর হইয়াছে—অশান্ত ক্ষেমঙ্কর পদচারণা করিতেছে সঙ্ঘের প্রাঙ্গনে—মার প্রলোভনের মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষেমঙ্কর প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহাকে জয় করিবার—কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না। সকল শুভবুদ্ধিকে পরাজিত করিয়া কেবলই অম্বাপালীর আহ্বান সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। সঙ্ঘের প্রহরী মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিল—আর

বিলম্ব নহে—সকলে নিদ্রিত—নিঃশব্দে ক্ষেমঙ্কর সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল—এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে মৃদু গম্ভীর স্বর ভাসিয়া আসিল—ক্ষেমঙ্কর !

চমকিয়া ক্ষেমঙ্কর পশ্চাতে চাহিল—সঙ্ঘস্থবির নিঃশব্দে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কহিলেন, এতরাত্রে একাকী কোথায় যাইতেছ বৎস ?

এই স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে ক্ষেমঙ্করের বেদনাহত জমাট হৃদয় গলিয়া গেল। শিশুর মত কাঁদিয়া সে স্থবিরের চরণ দুটি জড়াইয়া ধরিল, কহিল—আমি ভ্রষ্ট হইয়াছি—আর্য্য ! আমাকে শাস্তি দিন। মৃদু শান্তস্বরে স্থবির কহিলেন, শাস্তি কে কাহাকে দিবে পুত্র ! ভগবান তথাগত করুণাময়। সেখানে অন্য কোন শাস্তির স্থান নাই। প্রেমের শাসনই তাঁহার কঠোরতম শাস্তি।

কাঁদিয়া ক্ষেমঙ্কর কহিল—আমি মহাপাপিষ্ঠ—তথাগতের করুণালাভের যোগ্য নহি—

স্থবির কহিলেন—ভুল করিও না পুত্র—পতিতের জন্যই তাঁহার করুণা সর্ব্বাধিক। এখন আমাকে খুলিয়া বল কি হইয়াছে। ক্ষেমঙ্কর রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—কতবার বলিতে চাহিয়াছি কিন্তু কিছুতেই পারি না—আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

স্থবির কহিলেন—ভাল, তবে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও—অম্বাপালীর সহিত তোমার পরিচয় হইল কি প্রকারে ?

একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আর্ত্তস্বরে ক্ষেমঙ্কর কহিল—সে আমার পরিণীতা পত্নী।

স্থবির কহিলেন, যাহার কথা তুমি বলিয়াছিলে, সেই বিশাখা?

হাঁ, প্রভু।

স্থবির কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন—আমার সঙ্গে আইস।

চমকিয়া ক্ষেমঙ্কর কহিল—কোথায় আর্য্য?

অম্বাপালীর গৃহে—

আর্ত্তকণ্ঠে ক্ষেমঙ্কর কহিল—না প্রভু, না—আমি তাহার মোহমুক্ত হইয়াছি—সেখানে যাইব না।

স্থির কণ্ঠে স্থবির কহিলেন, পত্নীর পরে তোমার কর্ত্তব্য রহিয়াছে—তাহা পালন করিতে হইবে।

—কি সে কর্ত্তব্য?

স্বয়ং তথাগতও যে কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পান নাই—তাহাকে তুমি এড়াইবে কি করিয়া? আমার সঙ্গে আইস। নিঃশব্দে ক্ষেমঙ্কর তাঁহাকে অনুসরণ করিল। মনের কোণে ক্ষোভের সঙ্গে জাগিল কাহার সহিত কাহার তুলনা—যশোধরা আর অম্বাপালী? দেবী ও দানবী?

নির্জ্জন রাত্রে অম্বাপালীর গৃহদ্বারে সঙ্ঘস্থবিরকে দেখিয়া